তাওহীদের ডাক

৫৩তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১
Web : www.tawheederdak.com

- গাযওয়াতুল হিন্দ : একটি পর্যালোচনা
- আফগানিস্তান : আরেকটি সাম্রাজ্যের পতন
- মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন
- পারিবারিক বন্ধন
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা দুররুল হুদা

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

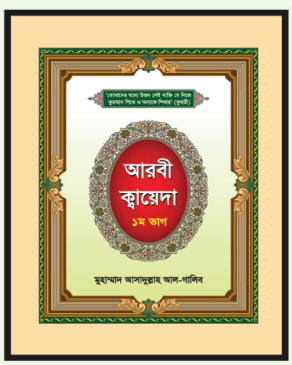

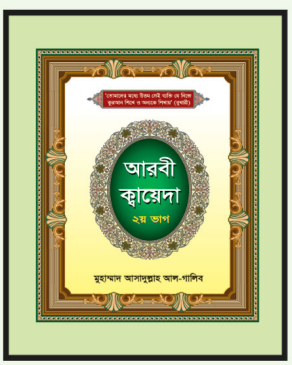

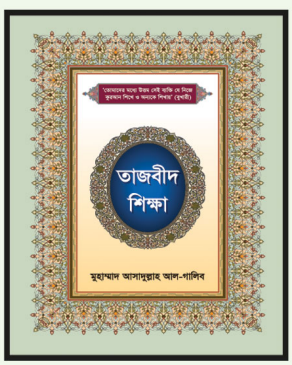

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৫৩ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫-২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ২
- কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা : ন্যায়বিচার — ৩

আক্বীদা
- গাযওয়াতুল হিন্দ : একটি পর্যালোচনা — ৬
  মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

তাবলীগ
- ছালাত মুমিনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য — ৯
  যহীরুল ইসলাম

তারবিয়াত
- কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর (৩য় কিস্তি) — ১২
  মিনারুল ইসলাম

সাময়িক প্রসঙ্গ
- আফগানিস্তান : আরেক সাম্রাজ্যবাদের পতন — ১৬
  মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত

ধর্ম ও সমাজ
- মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন — ২০
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

প্রবন্ধ
- ইসলামের প্রথম সমাচার (২য় কিস্তি) — ২৩
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা দুরুল হুদা — ২৫
- স্মৃতিচারণ : শেখ আব্দুছ ছামাদ — ৩১

চিন্তাধারা
- করোনাকালে মানবসমাজের জীবনমান উত্তরণে করণীয় — ৩৩
  মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন

সমকালীন মনীষী
- শায়খ নে'মাতুল্লাহ তুর্কী — ৩৬
  ফরীদুল ইসলাম

স্মরণীয় আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব
- মাওলানা মুহাম্মাদ বদীউযযামান — ৩৮
  মুহাম্মাদ রুকনুযযামান

পরশ পাথর
- করোনা বিপর্যয়ে ইসলামে ফিরলেন যারা — ৪০
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

শিক্ষাঙ্গন
- দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা (২য় কিস্তি) — ৪৩
  লিলবর আল-বারাদী

ইতিহাসের পাতা
- ইহূদী ঘরে জন্মানো এক খ্রিস্টান ভাষাবিদ লেইটনার এবং ব্রিটেনের শাহজাহান মসজিদ — ৪৭
- অনুবাদ গল্প : বিচক্ষণ বিচারক — ৪৯
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- জীবনের বাঁকে বাঁকে — ৫১
- সংগঠন সংবাদ — ৫৪
- সাধারণ জ্ঞান — ৫৫

সম্পাদকীয়

অহির আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর

ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ যমীনের উপর এমন কোন মাটি কিংবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে; আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। এদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করবেন এবং (স্বেচ্ছায়) ইসলাম কবূলের জন্য উপযুক্ত করে দেবেন। আবার কাউকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা বাধ্য হয়ে এই দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপর ইসলাম বিজয়ী হবে) *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪২)*।

এই হাদীছের প্রেরণাকে সামনে রেখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বর্তমান কার্যকাল (২০২০-২২)-এর জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তা হ'ল- 'অহির আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর'। অর্থাৎ আমরা চাই বাংলার যমীনে প্রতিটি গৃহে, প্রতিটি ঘরে অহির বার্তা পৌঁছে যাক সগৌরবে। ধনী হোক, গরীব হোক; শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত- কেউ যেন এই মহান দাওয়াত থেকে মাহরূম না হয়। প্রত্যেকের কাছে যেন এই বার্তা পৌঁছে যায় যে, ইসলাম হ'ল তাওহীদ তথা এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের নাম। এতে কোন শরীকানা নেই। হোক তা সৃষ্টি পরিচালনায় কিংবা মানব সমাজের দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, কার্যবিধিতে। রব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে, নামে-বৈশিষ্ট্যে-গুণাবলীতে সর্বত্র তাঁর এক ও একক অবস্থান। তাতে না আছে বিন্দুমাত্র ক্ষান্তি ঘটানোর কোন অবকাশ; আর না আছে অংশীদারিত্ব দাবী করার মত কোন ধৃষ্টতার সুযোগ। মহান প্রভূর স্পষ্ট ঘোষণা- জেনে রেখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। তিনি মহিমাময় বিশ্ব প্রতিপালক *(আ'রাফ ৫৪)*।

সুতরাং যাবতীয় সিজদা-আরাধনা, কামনা-বাসনা, আশা-ভরসা, ভক্তি-অনুরক্তি কেবল তাঁরই কাছে হ'তে হবে। মান্য করতে হবে কেবল তাঁরই দেয়া বিধি-বিধান, তাঁরই প্রেরিত প্রত্যাদেশ -নির্দেশনা। এর ব্যত্যয় ঘটানোর কোন সুযোগ নেই। মহান রবের এই একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নেয়া ও তাঁর ইচ্ছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিহিত জগৎ সংসারের মূল রহস্য। এতেই রয়েছে বান্দা সফলতা ও মুক্তির চাবিকাঠি। আর এর বিপরীতে স্রষ্টার আধিপত্যে সামান্যতম বিঘ্নতা ঘটায় এমন যা কিছু রয়েছে, তা-ই শিরকের প্রতিভূ, তা-ই পরিত্যাজ্য। তাতেই রয়েছে যাবতীয় অশান্তি আর ধ্বংসের সুলুক।

দ্বিতীয়তঃ পার্থিব জীবনে আমাদের একমাত্র চলার পথ রাসূল (ছাঃ) আনীত রবের প্রত্যাদেশ আর তাঁর প্রদর্শিত সুন্নাত। আমাদের যাবতীয় ইবাদত-আমল, আইন-সংবিধান, আচার-বিধি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, লাইফস্টাইল-সবই পালিত হবে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত পন্থায়। এতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণের দিশা, মানবীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঠিক পরিচর্যা। এর বিপরীতে যত পথ ও মত, যত বুযুর্গ ও আকাবির, যত মান্য ও শ্রদ্ধেয়- সবই অগ্রহণযোগ্য, মানবতা বিধ্বংসী ও অকল্যাণের দিশারী। তা আপাতঃদৃষ্টিতে যতই গ্রহণযোগ্য ও শ্রুতিমধুর হোক না কেন। সুতরাং নির্ভেজাল তাওহীদের বিশ্বাস এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নামই হ'ল ইসলাম। এর বাইরে ইসলামের নামে যত পথ ও মতের দিকে আহ্বান করা হোক না কেন, তা কখনই প্রকৃত ইসলাম নয়; বরং ইসলামের নামে মিথ্যাচার ও প্রতারণা। এই বার্তাটুকুই আমরা এদেশের সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। তাদেরকে জানাতে চাই- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। 'সকল বিধান বাতিল কর অহীর বিধান কায়েম কর'। কতজন এই দাওয়াত গ্রহণ করল বা না করল, তা আমাদের বিবেচ্য নয়; বরং কতজনের কাছে তা পৌঁছানো গেল সেটাই মূল বিবেচ্য।

এই দাওয়াতের ময়দানে যারা বার্তাবাহক হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের উদাত্ত আহ্বান হ'ল, যাবতীয় ষড়যন্ত্র-বিভ্রান্তি, অলসতা-বিলাসিতা দু'পায়ে দলে যার যতটুকু জ্ঞান, যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে সবটুকু ব্যয় করে সাধ্যমত মানুষের কাছে হকের দাওয়াত তুলে ধরুন। স্মরণ করুন আল্লাহর বাণী- 'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারী' (মুসলিম) *(হা-মীম সাজদাহ ৩৩)*। অন্তরে জাগ্রত রাখুন রাসূল (ছাঃ)-এর সেই চিরন্তন প্রেরণাবাণী- 'আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হেদায়েত লাভ করে, তা হবে তোমার জন্য (আরবের মূল্যবান সম্পদ) লাল উট লাভের চেয়ে উত্তম *(বুখারী হা/৩৭০১; মুসলিম হা/২৪০৬)*। সেই সাথে এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ কিছু গুণাবলীর অধিকারী হ'তে হবে। যেমন-

(১) লক্ষ্যের দৃঢ়তা এবং হকের উপর সদা ইস্তিকামাত থাকা। লক্ষ্যহীন ও দুর্বলচিত্ত মানুষ কখনও হকের দাওয়াত প্রচারের জন্য উপযুক্ত নয়। যিনি দাঈ হবেন, তাকে অবশ্যই লক্ষ্য সচেতন হ'তে হবে, সাহসী হ'তে হবে, আত্মবিশ্বাসী হ'তে হবে। কোন দুনিয়াবী স্বার্থে ও প্রলোভনে হক থেকে তার অবস্থান বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে না। বাতিলের চাকচিক্য দেখে তিনি প্রতারিত হবেন না। বিপদ কিংবা সমস্যার ঘনঘটা তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে না (২) নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। চারিত্রিক পবিত্রতা একজন দাঈর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে না, কুপ্রবৃত্তিকে দমনে সতর্ক থাকে না, তাক্বওয়া অবলম্বন করে না, সে ব্যক্তি খুব সহজেই শয়তানের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। সুতরাং দাঈকে অবশ্যই দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হ'তে হবে। *[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

ন্যায়বিচার

আল-কুরআনুল কারীম :

১- أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ-

(১) ‘(তুমি বল) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ফায়ছালাদানকারী হিসাবে কামনা করব? অথচ তিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন (আক্বীদা ও বিধানগত বিষয়ে) বিস্তারিত বর্ণনাসহ। আর যাদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব (তওরাত-ইনজীল) দিয়েছিলাম, তারা ভালভাবেই জানে যে, এটি (অর্থাৎ কুরআন) তোমার প্রভুর পক্ষ হ’তে সত্যসহ নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ’লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে’ *(আন‘আম ৬/১৪-১৬)*।

২- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ -

(২) ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

৩- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمانات إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً-

(৩) ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’ *(নিসা ৪/৫৮)*।

৪- وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ-

(৪) ‘যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ’লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ’লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ’লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন’ *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

৫- إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً- وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً- وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً-

(৫) ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না। আর তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(নিসা ৪/১০৫-১০৬)*।

৬- يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ-

(৬) ‘হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ’লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে’ *(ছ-দ ৩৮/২৬)*।

৭– وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ-

(৭) ‘তোমরা ইয়াতীমদের মাল-সম্পদের নিকটবর্তী হয়োনা উত্তম পন্থা ব্যতীত, যতদিন না ঐ ইয়াতীম তার যোগ্য বয়সে উপনীত হয়। তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর ইনছাফ সহকারে। বস্তুতঃ আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেই না। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে, তা নিকট জনের বিরুদ্ধে হলেও। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এসব বিষয় তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর’ *(আন‘আম ৬/১৫২)*।

৮– إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ –

(৮) ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর’ *(নাহল ১৬/৯০)*।

৯– يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً-

(৯) ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করো না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত’ *(নিসা ৪/১৩৫)*।

হাদীছে নববী :

১০– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، –

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, ‘যে দিন আল্লাহ্র রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।[১]

১১– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا–

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ‘ছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ’।[২]

১২– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ–

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমীরের (নেতার) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম (নেতা) হলেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছন থেকে যুদ্ধ করা হয়, তার দ্বারা (শত্রুদের কবল থেকে) নিরাপত্তা পাওয়া যায়। সুতরাং শাসক যদি আল্লাহ্র প্রতি ভয়প্রদর্শন পূর্বক প্রশাসন চালায় এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে, তাহ’লে এর বিনিময়ে সে ছওয়াব (প্রতিদান) পাবে। কিন্তু সে যদি এর বিপরীত কর্ম সম্পাদন করে, তাহ’লে তার গুনাহও তার ওপর কার্যকর হবে’।[৩]

১৩– وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ -

(১৩) আবু বুরায়দাহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিচারক তিন শ্রেণীর হয়। তন্মধ্যে এক প্রকারের (বিচারকদের) জন্য জান্নাত আর দু’ প্রকারের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সে বিচারক জান্নাতে যাবেন, যিনি হক

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১।*
২. *মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৯০।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬১।*

চিনলেন এবং তদানুযায়ী ফায়ছালা করেন। আর যে বিচারক হক উপলব্ধি করেও বিচার-ফায়ছালার মধ্যে অন্যায়-অবিচার করে, সে বিচারক জাহান্নামী এবং যে বিচারক অজ্ঞতার সাথে বিচার-ফায়ছালা করে, সেও জাহান্নামী'।[৪]

১৪- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبٍ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ -

(১৪) ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন প্রকার লোক জান্নাতবাসী। যথা- ১. দেশের শাসক, যিনি সুবিচারক ও দাতা, যাকে ভালো ও সৎ কাজ করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে, ২. যিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহকারী- নিকটাত্মীয় ও মুসলিমদের প্রতি কোমলপ্রাণ এবং ৩. যিনি নিষিদ্ধ বস্তু এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষাকারী- সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসাকারী'।[৫]

১৫- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

(১৫) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মাখযূমী গোত্রের জনৈকা নারীর চুরির ব্যাপারে কুরায়েশগণ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছিল। তারা (পরস্পরের মধ্যে) বলল, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ এতদসম্পর্কে কে সুফারিশ করবে? তারাই পুনরায় বলল, উসামা ইবনু যায়দ ব্যতীত কে আছে, এ ব্যাপারে সাহস করার? কেননা সে রাসূল (ছাঃ)-এর অত্যন্ত আস্থাভাজন। অতঃপর উসামা তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এতদসম্পর্কে জানালেন। এতদশ্রবণে রাসূল (ছাঃ) (ক্রোধান্বিত হয়ে) বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধিতে এই সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি (ছাঃ) দাঁড়িয়ে বক্তব্যদানকালে বললেন, হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ আচরণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো সম্মানী লোক চুরি করত, তাহ'লে তাকে মাফ করে দিত। আর যদি কোনো অসহায় দরিদ্র শ্রেণীর লোক চুরি করত, তবে তার ওপর দণ্ড কার্যকর করত। আল্লাহ্‌র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ'লে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. সাঈদ ইবনুল যুবাইর আব্দুল মালেক-এর প্রশ্নের জবাবে ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে বলেন, 'আদল বা ন্যায়বিচার চার ভাবে হয়ে থাকে ক. বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার *(মায়েদাহ ৫/৪২)* খ. কথায় বলার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার *(আন'আম ৬/১৫২)* গ. ফিদইয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার *(বাক্বারাহ ২/১২৩)* ঘ. শিরক করার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার *(আন'আম ৬/১)*'।[৭]

২. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযী বলেন, 'তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং আদল বা ন্যায়বিচার হ'ল পরিপূর্ণ গুণাবলীর আধার'।[৮]

৩. ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, 'আদল বা ন্যায়বিচারের ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ন্যায়বিচার সম্পন্ন দেশে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য নেমে আসে, যদিও সেটি আল্লাহদ্রোহী দেশ হয়। পক্ষান্তরে ন্যায়বিচারশূন্য যালেম দেশ থেকে মহান আল্লাহ সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেন যদিও তা একটি ইসলামী দেশ হয়'।[৯]

৪. ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে.. *(মায়েদা ৮)*' আয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'যদি কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি ইনছাফ করার নির্দেশ থাকে, তবে যারা ফাসেক, যালেম কিংবা শরীআতের ভুল ব্যাখ্যাকারী মুমিন, তাদের প্রতি ইনছাফ করা নিঃসন্দেহে অধিকতর আবশ্যক'।[১০]

সারবস্তু :

১. ন্যায়বিচার হ'ল সামাজিক শান্তি, স্থিতি ও শৃঙ্খলার সোপান।

২. ন্যায়বিচারই বিচার বিভাগ ও প্রশাসনযন্ত্রের মূল উপাদান।

৩. ন্যায়বিচারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ। ফলে তিন শ্রেণীর বিচারকদের মধ্যে শুধুমাত্র পক্ষপাতহীন বিচারকই ন্যায়বিচার করতে পারে।

৪. ন্যায়বিচারকের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। আর যালিম আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

৫. ইসলামের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হ'ল মাযলুম মানবতাকে ন্যায়বিচারের স্বাদ আস্বাদন করানো।

৬. আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র তাওহীদী বিধান কায়েম করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল ন্যায়বিচার।

---

৪. আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৩৫।
৫. মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৯৬০।
৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১০।
৭. আত-তাওফীক আলা মুহিম্মাতিত তাআরীফ লিল মানাবী ৫০৬ পৃ.।
৮. তাফসীর ইবনুল কাইয়িম ১৭৯ পৃ.।
৯. আল-হিসবাহ ১৬/১৭০ পৃ.।
১০. আল-ইসতিক্বামাহ ১/৩৮ পৃ.।

গাযওয়াতুল হিন্দ : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা : ইসলাম সার্বজনীন কালজয়ী আদর্শ হিসাবে বিশ্বের প্রতিটি বাড়িতে বা অঞ্চলে পৌঁছে যায়। 'একটি আয়াত জানা থাকলেও প্রচার কর' ইসলাম প্রচারে রাসূল (ছাঃ)-এর এমন হাদীছের অনুসরণ করা ছাহাবীদের নিকট প্রণিধানযোগ্য আমল ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় দ্বীনের সর্বাত্মক প্রচার-প্রসারে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন ইসলামী খেলাফতকালে মুসলমানদের বিশ্বজয় ত্বরান্বিত হতে থাকে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েও পরিতৃপ্ত হননি। তিনি চেয়েছিলেন গোটা বিশ্বে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছে দিবেন। প্রাণভরা আশা নিয়ে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী খলীফা ওছমান (রাঃ) সুদূর চীনে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তারা তৎকালীন চীন সম্রাটের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। এরপরে ব্যাপক হারে ইসলামের বাণী দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে দলে দলে মুসলমানেরা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। হিন্দ বা ভারতবর্ষে তো রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ইসলাম দাওয়াত পৌঁছে যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎ বাণী থাকায় আমীরে মু'আবিয়ার আমলে ছাহাবী ও তাদের অনুসারীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ভারতবর্ষে ছুটে আসেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তৎপরবর্তীতে গযনীর সুলতান মাহমূদ ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের উপর বিজয় লাভ করেন। এভাবে হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষে মুসলমানেরা প্রায় আটশ বছর শাসন করেন। দূর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। ইংরেজ শাসনের ২০০ বছর পরে আবার হিন্দুস্তানের বড় অঞ্চলের শাসনভার হিন্দুদের হাতে চলে যায়।

এক্ষণে গাযওয়াতুল হিন্দ বা 'হিন্দুস্থানের যুদ্ধ' অর্থাৎ ভারত বা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তিতে পতিত একদল মানুষ মনে করে, বর্তমান হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে হাদীছে বর্ণিত মর্যাদা লাভ করা যাবে। এই হাদীছের সঠিক মর্ম না বোঝার কারণে একদল যুবক জড়িয়ে পড়ছে ইসলাম ও রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে। অযথা নষ্ট করছে অর্থ ও মূল্যবান মেধা। এমনকি বিপথগামী হয়ে বিলিয়ে দিচ্ছে নিজের মূল্যবান জীবনটাকেও। অথচ জান্নাত পাওয়ার অসংখ্য সহজ ও সরল পথের দিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করছে না। কেন এই ভ্রান্ত নেশায় জড়িয়ে পড়ছে এই যুবকেরা? এর ভিত্তিই বা কী? হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা বুঝেই তারা আবেগে ভেসে এই পথে এগুচ্ছে। আসলে হাদীছে কী বলা হয়েছে বা এর সঠিক ব্যাখ্যাই বা কী? নিম্নের আলোচনায় তা স্পষ্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গাযওয়াতুল হিন্দ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীছ সমূহের পর্যালোচনা :

গাযওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে বেশ কিছু বর্ণনা এসেছে যার দু'একটি ব্যতীত সবগুলো যঈফ অথবা জাল। যেমন :

1-عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ : عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ-

(১) ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে যারা হিন্দুস্থানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর একটি হচ্ছে যারা ঈসা (আঃ)-এর সাথে থাকবে।[১] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, من أدركه منكم فليقرئه مني السلام 'যে তোমাদের মধ্যে তাঁকে (ঈসাঃ)-কে পাবে, আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবে'।[২]

2-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنْهُ ، قَالَ : وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ-

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাথে হিন্দুস্থানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সে যুদ্ধ পেলে আমার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করব। আর আমি মারা গেলে শহীদদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হব এবং ফিরে এলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্ত আবু হুরায়রা'।[৩]

3-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنْهُ ، قَالَ حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي هَذِهِ

১. *নাসাঈ হা/৩১৭৫; ছহীহাহ হা/১৯৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৪০১২, সনদ ছহীহ।*
২. *আলবানী, কিছছাতু মাসীহিদ দাজ্জাল ১৪২ পৃ.।*
৩. *নাসাঈ হা/৩১৭৪; আহমাদ হা/৭১২৮; বাযযার হা/৮৮১৯; সাঈদ ইবনু মানছুর হা/২৩৭৪, সনদ যঈফ।*

الأُمَّةَ بَعْثٌ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ. "فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتَشْهَدْتُ فَذَلِكَ وَإِنْ أَنَا - فَذَكَرَ كَلِمَةً - رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ أَعْتَقَنِى مِنَ النَّارِ .

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সত্যবাদী বন্ধু রাসূল (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 'এই উম্মতের মধ্যে থেকেই অভিযান প্রেরিত হবে সিন্দ ও হিন্দে। আমি সেটা পেলে তাতে শহীদ হওয়ার কামনা করি। আর যদি ফিরে আসি তাহলে আমি মুক্ত আবু হুরায়রা- অবশ্যই আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হয়েছে'।[৪]

٤- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَغْزُو قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي الْهِنْدَ ، فَيُفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُلْقُوا بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مَغْلُولِينَ فِي السَّلاسِلِ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ ، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَى الشَّامِ فَيَجِدُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ-

(৪) ছাফওয়ান বিন আমর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একদল লোক হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের রাজাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়ার দিকে ফিরে যাবে ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ)-কে শামে পেয়ে যাবে'।[৫]

٥-عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: يَبْعَثُ مَلِكٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا، وَيَأْخُذُ كُنُوزَهَا، فَيَجْعَلُهُ حِلْيَةً لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُقْدِمُوا عَلَيْهِ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مَغْلُولِينَ، يُقِيمُ ذَلِكَ الْجَيْشُ فِي الْهِنْدِ إِلَى خُرُوجِ الدَّجَّالِ-

(৫) কা'ব আল আহবার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বায়তুল মাকদিসের সুলতান হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করবে। তারা বিজয় লাভ করবে এবং ধনভান্ডার গ্রহণ করে বায়তুল মাকদেসের সৌন্দর্যবর্ধনে খরচ করবে। তারা হিন্দুস্তানের রাজাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুসলিম শাসকের নিকট উপস্থিত করবে। ঐ সৈন্যদল দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে'।[৬]

'গাযওয়াতুল হিন্দু' সম্পর্কিত পাঁচটির বর্ণনার মধ্যে চারটিরই সনদ যঈফ। তবে প্রথম বর্ণনাটি ছহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত, যাতে বলা হয়েছে, 'আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে যারা হিন্দুস্থানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর একটি হচ্ছে যারা ঈসা (আঃ)-এর সাথে থাকবে।[৭] হিন্দুস্থানবাসীদের সাথে যুদ্ধকারী দলটি জাহান্নাম থেকে নাজাতপ্রাপ্ত। এক্ষণে যুদ্ধটি হয়ে গেছে? নাকী হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত যুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সর্বপ্রথম ১৫ হিজরীতে ওছমান বিন আবুল আছের নেতৃত্বে একটি সেনাদল হিন্দুস্থানে প্রেরিত হয়। যারা হিন্দুস্থানের থানা, ব্রুছ ও দেবল বন্দরে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। থানাকে বর্তমানে মুম্বাই, ব্রুছকে গুজরাট এবং দেবলকে করাচী বলা হয়। তারা এ সময় সরনদ্বীব জয় করেন। যাকে বর্তমানে শ্রীলঙ্কা বলা হয়'।[৮] ওছমান বিন আবিল আছের পর তার ভাই মুগীরা বিন আবিল আছও নতুনভাবে অভিযান পরিচালনা করেন'।[৯]

এরপর ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর আমলে হাকীম বিন জাবালাহ আবাদীকে হিন্দুস্তানের অবস্থান জানার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি ঘুরে এসে খলীফাকে প্রতিকূল অবস্থার কথা জানালে তিনি নতুন করে কোন অভিযান প্রেরণ করেননি। ৩৮ হিজরীর শেষে এবং ৩৯ হিজরীর শুরুর দিকে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হারেছ বিন মুর্রাহ আবাদীর নেতৃত্বে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। তিনি বিজয় লাভ করেন এবং অনেক গণীমতের সম্পদ লাভ করেন। এরপর ৪৪ হিজরীতে আমীরে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলে মুহাল্লাব বিন আবী ছাফরার নেতৃত্বে অভিযান প্রেরিত হয়। তিনি মুলতান ও কাবুল অঞ্চলে পৌঁছলে শত্রুর মুখোমুখি হন এবং শত্রুদের হত্যা করে বিজয় লাভ করেন। ১৮ জন তুর্কী অশ্বারোহী তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাদের হত্যা করেন এবং বহু গণীমতের সম্পত্তি লাভ করেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন সাওয়ার আবাদীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরিত হয়। তিনি কীকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন এবং বহু সম্পদ লাভ করেন। তিনি একটি কীকানী ঘোড়া মু'আবিয়া (রাঃ)-এর জন্য হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করেন'।[১০] এরপর ৯৩ হিজরীতে খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে (৮৬-৯৬ হি.) মুহাম্মাদ বিন কাসেম ছাক্বাফীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সিন্ধু ও হিন্দুস্থান বিজীত হয়। তিনি প্রভাবশালী রাজা দাহিরকে পরাস্ত করে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হন।[১১]

এভাবে মুসলমানগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর বিজয় লাভ করেন। যা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে গযনীর

৪. *আহমাদ হা/৮৮০৯; ইবনু হাজার ইত্তেহাফ হা/১৭৯৫০; ইবনু কাছীর, আল বিদায়াহ ৯/২১৮, অত্র হাদীছের সনদে বারা বিন আব্দুল্লাহ গনভী থাকার কারণে সনদ যঈফ। তাছাড়া এতে ইনকেতা' রয়েছে।*

৫. *নাঈম ইবনু হাম্মাদ, আল ফিতান হা/১২০২ ও ১২৩৯, উক্ত হাদীছের সনদও যঈফ। প্রথম এতে ওয়ালিদ বিন মুসলিম আনআনা করেছেন, দ্বিতীয়ত: এতে ইরসাল রয়েছে।*

৬. *নাঈম ইবনু হাম্মাদ, আল-ফিতান হা/১২১৫, উপরোক্ত হাদীছটির বর্ণনাকারী ইহূদী পন্ডিত কা'ব আল আহবার হওয়ায় সনদ অগ্রহণযোগ্য।*

৭. *নাসাঈ হা/৩১৭৫; ছহীহাহ হা/১৯৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৪০১২, সনদ ছহীহ।*

৮. *কাযী আতহার মুবারকপুরী, আল-ইক্বদুছ ছামীন ফী ফুতূহিল হিন্দ (কায়রো : দারুল আনছার, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯ হি./১৯৭৯) ১/২৬, ৪০, ৪২, ৪৪।*

৯. *রাসায়েলে ইবনু হাযম ২/১৩২; বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান ৪/১৬।*

১০. *বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান ৪১৬-১৮ পৃ.; ইয়াকুব আল হামাভী, মু'জামুল বুলদান ৪/৪২৩।*

১১. *আল-বিদায়াহ ৯/৭৭, ৯৫; আল-ইক্বদুছ ছামীন ১/১৪১-৪২।*

সুলতান মাহমূদ বিন সুবুকতিগীন ও তাঁর প্রতিনিধিদের হিন্দুস্তানের উপর ১৭ বার আক্রমণ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। হাফেয ইবনু কাছীর, যাহাবী ও ইবনুল আছীরসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, وَقَدْ غَزَاهَا الْمَلِكُ السَّعِيدُ الْمَحْمُودُ مَحْمُودُ بْنُ سُبُكْتِكِينَ صَاحِبُ غَزْنَةَ وَمَا وَالَاهَا، فِي حُدُودِ أَرْبَعِمِائَةٍ، فَفَعَلَ هُنَالِكَ أَفْعَالًا مَشْهُورَةً، وَأُمُورًا مَشْكُورَةً؟ كَسَرَ الصَّنَمَ الْأَعْظَمَ الْمُسَمَّى بِسُومَنَاتَ، وَأَخَذَ قَلَائِدَهُ وَجَوَاهِرَهُ وَذَهَبَهُ وَشُنُوفَهُ، وَأَخَذَ مِنَ الْأَمْوَالِ مَا لَا يُحْصَى، وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ سَالِمًا مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا. ‘সৌভাগ্যবান, প্রশংসিত, গযনীর সুলতান মাহমূদ বিন সুবুকতিগীন এবং গভর্নরেরা ৪০০ হিজরীর দিকে হিন্দুস্তানবাসীর সাথে যুদ্ধ করেন। তিনি সেখানে যে অভিযান প্রেরণ করেন তা ছিল প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত। তিনি বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের সকল মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেন এবং তথাকার যাবতীয় অলংকার, মণিমুক্তা, স্বর্ণ ও রোপ্যগুলো বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি সেখানে অগণিত সম্পদ লাভ করেন এবং নিরাপদে বিজয়ীবেশে দেশে ফিরে যান।[১২] তারও পরে আব্বাসীয় যুগে ৬০২ হিজরীতে দিল্লী ও বাংলা বিজিত হয় এবং সারা ভারত বর্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

আর এভাবেই পুরো ভারতের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব চলে আসে এবং পরে মামলুক, খিলজী, তুঘলক, সাইয়িদ, লোদী এবং মুঘলেরা পুরো ভারতবর্ষ শাসন করে। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, হাদীছে বর্ণিত হিন্দুস্তান বাসীর সাথে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। এক্ষণে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ভারতবাসীর সাথে যুদ্ধ হবে শেষ যামানায়, যেমনটি কোন কোন বিদ্বান মনে করেন।[১৩] এতেও কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ও কোন দলকে নির্দিষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। কারণ রাসূল সাধারণভাবে একটি দলের কথা বলেছেন।

শেষকথা :

গাযওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে উক্ত আলোচনার পর একথা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়েছে যে, হাদীছে বর্ণিত গাযওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দুস্তানবাসীর সাথে যুদ্ধ ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে, যা বিদ্বানদের ব্যাখ্যায় সুপ্রমাণিত। তবুও যদি কারো মতে এই যুদ্ধ শেষ যামানায় হবে বলে ধরে নেয়া হয়, তবুও এ কথা নিশ্চিত করার সুযোগ নেই যে, ঠিক কোন সময় এটি সংঘটিত হবে বা কার নেতৃত্বে হবে। সুতরাং গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে কতিপয় যুবসমাজের অতিশয়োক্তি, মাতামাতি কিংবা রঙিন স্বপ্ন দেখানো একেবারেই অর্থহীন কর্ম। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে জান্নাতের শর্টকাট রাস্তা খুঁজে পাওয়ার নামে একশ্রেণীর মুসলিম যুবক উগ্রবাদ ও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা খুবই ভয়ংকর। এই চরমপন্থীদের কারণে মুসলিম উম্মাহ ভেতরে ও বাইরে থেকে চরম অনিরাপদ ও কোনঠাঁসা হয়ে পড়ছে। বিশ্বব্যাপী নষ্ট হচ্ছে দাওয়াতের উর্বর ক্ষেত্রসমূহ। মহান আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দ্বীনের নামে হৃদয়কে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে হেফাযত করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

১২. *আল বিদায়া ১৯/১১; আল-কামেল ফিত তারীখ ৭/৬০৭’ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২৭/২৪৪।*
১৩. *হামূদ তুওয়াইজেরী, ইত্তেহাফুল জামা‘আত ১/৩৬৬।*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সদা সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। যেখানে অনৈতিকতার হাতছানি, যেখানে পাপের সম্ভাবনা, সেখান থেকে নিজেকে যোজন যোজন দূরে রাখতে হবে।

(৩) সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বত্রই সফল। যার মধ্যে উক্ত গুণাবলীর প্রভাব যত বেশী, সে লক্ষ্য অর্জনে তত বেশী সফল। সুতরাং দাঈর জন্য সর্বাবস্থায় সৎ, নীতিবান ও ন্যায়পরায়ণ থাকা অপরিহার্য। (৪) ধৈর্য। বিপদসংকুল পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নানা মাত্রার প্রতিকূল পরিবেশ আমাদেরকে সদা আচ্ছন্ন করে। হতাশা, কষ্ট, ভয়-ভীতি আঁকড়ে ধরে। এমতাবস্থায় আমাদের রক্ষাকবচ অস্ত্র হ’ল ধৈর্য। ধৈর্যশীলতার একমাত্র পরিণাম সফলতা। সুতরাং একজন দাঈকে সমাজ সংস্কারের ময়দানে ধৈর্যশীলতার মূর্ত প্রতীক হ’তে হবে (৫) সদাচরণ। দাঈ যত জ্ঞানী বা পরহেযগার হোক না কেন, তার ভাষা ও আচরণ যদি হয় অসংযত, যদি তার অন্তর হয় অপরের প্রতি শুভকামনাহীন ও বিদ্বেষপরায়ণ; তার পক্ষে দাওয়াতী ময়দানে নামাই অর্থহীন। দাঈকে অবশ্যই সদাচরণকে রপ্ত করতে হবে। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মত উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন হতে হবে।

পরিশেষে কর্মী সম্মেলন ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রাণপ্রিয় কর্মী ভাইদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, অহীভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের বার্তাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার মিশনকে যেন আমরা আমাদের জীবনের মহত্তম লক্ষ্য বানিয়ে নেই এবং এই মহান সংস্কার আন্দোলনের যোগ্য কর্মী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলি। আমাদের সমাজ ও আমাদের পরিপার্শ্বকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করি। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন পৌঁছে যায় হকের আওয়াজ। বাংলার যমীন যেন একদিন পরিণত হয় বিশুদ্ধ দ্বীনের এক উর্বর চারণক্ষেত্রে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের মর্দে মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিয়ে জান্নাতের চিরশান্তির আবাসস্থলের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন!

ছালাত মুমিনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য

-যহীরুল ইসলাম

ছালাত এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকের উপর জোরালো তাকীদ এসেছে। এটি সঠিকভাবে আদায়ের জন্য ইসলামে নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতার পরিধিও রচিত হয়েছে। যেমন শাসকগণ প্রজাগণের উপর দায়িত্বশীল, পিতা পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তানাদির দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্বশীলতার জন্য ইসলাম পুণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও দিয়েছে। যে ব্যক্তির ছালাত যত সুন্দর ও পরিপাটি, সে ততই জান্নাতের পথে অগ্রগামী। কেননা বিচার দিবসে ছালাতই সকল ইবাদতের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবে। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ইসলামের মূল স্তম্ভ, যা ছিন্ন হলে ইসলামের সর্বশেষ রশি ছিন্ন হবে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হ'ল-

১. ছালাত ইসলামের অন্যতম রুকন : হাদীছে এসেছে, ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদ (রিয়াদ এলাকার) অধিবাসীদের একজন আলুলায়িত কেশী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভন ভন শব্দ শুনছিলাম, আর তার কথা বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত সে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্নিকটে পৌঁছালো এবং (তখন বুঝলাম) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, (ইসলাম হল) خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত দিনে-রাতে'। সে বলল, তা ছাড়া আমার উপর অন্য ছালাত আছে কি? তিনি বললেন, না। তবে নফল আদায় করতে পার। এরপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ছিয়াম ও যাকাত সম্পর্কে বললেন। ছালাতের ন্যায় একই রকম কথপোকথন হ'ল। অবশেষে বর্ণনাকারী বলেন, সেই ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন, وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ আল্লাহ্র শপথ! আমি এর চেয়ে অধিকও করব না, কমও করব না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ সে সফলকাম হবে যদি সে সত্য বলে থাকে'।[১]

২. ছালাত জান্নাতের পথ দেখায় ও জাহান্নাম থেকে বাঁচায় : হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী (ছাঃ) নিকটে এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন এক আমলের কথা বলে দিন, যার উপর আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ– 'আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম রাখবে'। তখন লোকটি রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্য শুনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন বিদ্যমান, আমি এর চেয়ে বেশী করব না। অতঃপর সে পিঠ ফিরে চলতে লাগল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا 'যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের কোন লোক দেখতে আগ্রহী, সে যেন এই লোকটিকে দেখে'।[২]

অপর এক হাদীছে এসেছে, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। একদিন ভোর বেলা আমি তার সাথে পথ অতিক্রমকালে তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে একটি কাজের কথা বলেন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, 'তুমি বিরাট একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে সহজ হবে, যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দিবেন'। আর তা হ'ল- وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাযানে ছিয়াম পালন করবে এবং কাবা ঘরে হজ্জ করবে।' অতঃপর তিনি বললেন, তোমাকে কল্যাণের দ্বার সমূহ বলে দিব কি? তা হ'ল– الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ– 'ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ, আর ছাদাক্বা মিটিয়ে দেয় পাপ যেমন পানি নিভিয়ে দেয় অগ্নি। আর মধ্যরাতে মানুষের ছালাত (যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে)। অতঃপর তিনি (তার কথার স্বপক্ষে) তেলাওয়াত করলেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'তারা তাদের শয্যা থেকে পিঠকে পৃথক করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউ জানেনা তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী সকল লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃত কর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৬, ১৭)*। অতঃপর বললেন, আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি ও তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব নাকি? মু'আয

১. *বুখারী হা/৪৬ ।*

২. *আহমাদ হা/৮৩১০; বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৮ ।*

বললেন, হ্যাঁ (অবশ্যই বলেন) হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, সমস্ত বিষয়ের মস্তক হ'ল ইসলাম, তার স্তম্ভ হ'ল ছালাত এবং উচ্চতম চূড়া হ'ল জিহাদ।[৩]

৩. ছালাত শিক্ষাদানে দুনিয়ায় ফেরেশতার আগমন : ছালাত এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে দুনিয়ায় আল্লাহ ফেরেশতা নামিয়ে দিয়েছেন ও হাতে কলমে শিখিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকটে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান হ'ল আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশ্তাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, বিচার দিবসের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলাম কী? তিনি বললেন, الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ 'ইসলাম হ'ল আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করবেন, আর তাঁর সাথে শিরক করবেন না। ছালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন, রামাযানে ছিয়াম পালন করবেন। এরপর আরও দু'টি প্রশ্ন করলেন, ইহসান ও ক্বিয়ামত সম্পর্কে'। অবশেষে যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। তারা তাকে খুঁজে পেল না। তখন তিনি বললেন, هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ– 'ইনি জিব্রীল (আঃ), লোকদেরকে তিনি দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন'।[৪]

৪. ছালাত আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল : ছালাত ইসলামের অন্যান্য সকল আমলের চেয়ে মহান আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় আমল। তাই ছালাতের ভুলভ্রান্তি কোনভাবেই গ্রহণীয় নয়। নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে। তিনি বলেন, 'কোন আমল আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে (ওয়াক্তমত) ছালাত আদায় করা। তিনি বললেন, তারপর কোন আমল? তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। তিনি বললেন, তারপর কোন আমল? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। তিনি বললেন, এ পর্যন্ত তিনি আমাকে বলেছেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞাসা করতাম তাহলে তিনি আমাকে আরও বলতেন'।[৫]

উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নোত্তরে ছালাতের বিষয়টি মূখ্য, যা আমাদেরকে ছালাতের গুরুত্ব অনুধাবনের নির্দেশ দেয়। আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত করার প্রেরণা যোগায়। আর চূড়ান্ত ভাবে জানিয়ে দেয় ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত ছালাত।

৫. ছালাত যুগে যুগে সৎকর্মশীল বান্দাগণের চিরাচরিত অভ্যাস :

বান্দা যখন ছালাত আদায় করে, তখন যেন সে তার রবের সাথে চুপি চুপি কথা বলে। রাসূল (ছাঃ)-একদিন বায়তুল্লায় ছালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় মক্কার কাফেরেরা তাকে উটের ভুঁড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কারণ কাফেররা জানত যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছালাতে বেখবর নিমগ্ন হয়ে যেতেন। ফলে তারা এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চেয়েছিল। অবশেষে যে মহান আল্লাহ্র প্রতি তাঁর এতটা ভালোবাসা ও নিগূঢ় প্রেম, সেই প্রভুর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছিল। কাফেরদের চক্রান্ত ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল। শুধু রাসূল (ছাঃ) নয়, সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈসহ পূর্বেকার সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের মাঝে ছালাতের পাবন্দীর গুণ যুগে যুগে অক্ষুণ্ন ছিল। নিম্নে এর কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হ'ল-

ইবরাহীম (আঃ)-এর ছালাতের প্রতি অনুরাগ : দূর অতীতে যখন মক্কায় ইবরাহীম (আঃ) তার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র প্রাণপ্রিয় দুগ্ধপোষ্য পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ও স্ত্রী হাযেরাকে কা'বাতে আল্লাহ্র নির্দেশে রেখে যান, সে সময় ইসমাঈলের মা তাকে অনুসরণ করে বহুবার জিজ্ঞাসা করছিলেন 'হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমাদের এই উপত্যাকায় রেখে, যেখানে কোন জনমানব নেই, নেই কোন জীবনোপকরণ? কিন্তু তিনি তার দিকে একবারও ফিরে তাকালেন না। অবশেষে ব্যর্থ ব্যাকুলতায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আল্লাহ্র নির্দেশে এরূপ করছেন? তখন ইবরাহীম (আঃ) শুধুমাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, হ্যাঁ। এই কথা শুনে ইসমাঈলের মা বলে উঠলেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না এবং ফিরে গেলেন যেখানে ইবরাহীম (আঃ) তাকে রেখে আসছিলেন। ব্যাথা ভারাক্রান্ত ইবরাহীম (আঃ) যখন ছানিয়ার (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান মদীনার উপকণ্ঠে) পৌঁছলেন, যেখান থেকে তাদের আর দেখা যায় না, তখন কিবলামুখী হয়ে দু'হাত আল্লাহ্র দিকে উঠালেন, তাদের জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন। তিনি প্রার্থনার মধ্যে যতকিছু তাদের কল্যাণ কামনায় ব্যক্ত করলেন তার মধ্যে অন্যতম হ'ল তারা যেন ছালাত কায়েম করে, যা সূরা ইবরাহীমের ৩৫-৪০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ছালাতের বিষয়টি তাঁর প্রার্থনায় দু'বার উল্লেখিত হয়েছে'।[৬] মহান আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে এসেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! যেন তারা ছালাত কায়েম করে।

অতঃপর তিনি সর্বশেষে আবারও বললেন, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ 'হে আমার প্রতিপালক!

---

৩. আহমাদ হা/ ২১৫১১; তিরমিযী হা/২৬১৬, ইবনু মাজাহ হা/ ৩৯৭৩।
৪. বুখারী হা/৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম হা/৯ ।
৫. বুখারী হা/ ৫২৭; মুসলিম হা/ ৮৫।
৬. বুখারী হা/৩০৮৩; আবু দাউদ হা/২৭৮১।

আমাকে ছালাত কায়েমকারী কর এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল কর!' *(ইবরাহীম ১৪/৪০)*। তিনি ঐ কষ্টদায়ক মুহূর্তেও ছালাতকে ভুলেননি। তারই ফলশ্রুতিতে ইসমাঈল (আঃ) স্বীয় পরিবারে ছালাত প্রতিষ্ঠা করে মহান রবের রেযামন্দী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তাঁর দো'আর স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا - وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا– 'স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা। সে তো ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী। সে তার পরিবারবর্গকে ছালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাঁর প্রতিপালকের সন্তোষভাজন' *(মারিয়াম ১৯/৫৪-৫৫)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছালাতকে যেভাবে মহব্বত করতেন : রাসূল (ছাঃ) একদিন একান্ত পারিবারিক আলাপে তাঁর তিনটি সর্বাধিক পসন্দনীয় বিষয় ব্যক্ত করলেন। যার অন্যতম একটি ছালাত। আর তার এই পসন্দের বিষয়টি যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে তার গোটা নবুঅতী যিন্দেগীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন এই ছালাতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি তায়েফে মার খেয়েছেন। অনুকুল পরিবেশে তিনি ছালাত এতই দীর্ঘ করতেন যে, তাঁর দু'পা ফুলে যেত। রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের প্রতি মহব্বতের প্রগাঢ়তা ছিল অত্যন্ত প্রবল, যা ছিল ঐকান্তিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। যার বাস্তব নমুনা তাঁর মুমূর্ষুকালীন অবস্থাতেও প্রস্ফূটিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও ছালাত ছালাত বলে জাতিকে হুঁশিয়ার করেছেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতে আসার আগ্রহ বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসতে চান। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দেন এবং দরজার পর্দা ঝুলিয়ে দেন।[৭] সোমবার ফজরের জামা'আত চলা অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঘরের পর্দা উঠিয়ে একদৃষ্টে মসজিদে জামা'আতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর ভাগ্যে যোহরের ওয়াক্ত আসার সুযোগ আর হয়নি। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর চার দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার তিনি সর্বশেষ ইমামতি করেন মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। অসুখ বৃদ্ধি পাওয়াতে এশার ছালাত থেকে আর ইমামতি করতে পারেন নি। তবুও তাঁর সর্বশেষ প্রচেষ্টা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি তিন তিনবার করে এশার ছালাতের জন্য ওযূ করেন ও অজ্ঞান হয়ে যান। রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং ছালাতের মহব্বতে পাগলপারা ছিলেন। তিনি বলেন, حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. 'সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে'।[৮]

আবু বকর (রাঃ)-এর ছালাতের ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়চিত্ত : রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তিনিই দৃঢ়চিত্ত হয়ে ইসলামী খিলাফতের হাল ধরেন এবং ইসলামী বিধানাবলী অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে রীতিমত জিহাদ ঘোষণা করেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন ঘোষণা করেন, وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ- 'আল্লাহ্র শপথ! 'যে ব্যক্তি ছালাত ও যাকাত এর মাঝে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব'।[৯] এখন আমরা বলছি ঈমানের পর ছালাত আদায়কারী যাকাত দিতে শৈথিল্য করার প্রেক্ষিতে যদি আবু বকর (রাঃ) এরূপ কঠোর হন। তাহলে ঈমানের পর ছালাত আদায়ে কেউ শৈথিল্য দেখালে তিনি কতটাই না ক্রোধান্বিত হতেন! এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওমর (রাঃ) বলেন, فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ 'আল্লাহ্র শপথ! অচিরেই আমি দেখলাম যে, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আবু বকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ'।[১০]

ওমর (রাঃ)-এর ছালাতের প্রতি মহব্বত : ওমর (রাঃ) ছালাতকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। একদিকে তিনি ছিলেন শাহাদাৎপিয়াসী অন্য দিকে তিনি দো'আ করতেন তিনি যেন মদীনাতেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তার দু'টি দো'আই কবুল করেন। একদা মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাতে ইমামতিকালীন সময় আবু লু-লু নামের কুখ্যাত খারেজী তাঁকে ছুরির আঘাতে আহত করে ফেলে। তখন তিনি বলেন, আমাকে কোন কুত্তায় কামড় মেরেছে? অতঃপর তিনি বসে ছালাত সম্পাদনের শেষ চেষ্টা করেন এবং অবশেষে তিনি অন্যজনকে ইমামতির দায়িত্ব দেন। কিন্তু প্রচন্ডভাবে জখম হওয়ার ফলে রক্তক্ষরণের এক পর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। এদিকে আবু লুলু ধরা পড়ে যাওয়া মাত্রই আত্মহত্যা করে ফেলে। অতঃপর ছালাতের জামা'আত সম্পন্ন হয়। ওমর (রাঃ)-এর যখন চেতনা ফিরে আসল, তখন যে কথা তিনি বলেছিলেন তা হল, মুসলিমদের ইমাম কি ছালাত সম্পন্ন করেছে? আল্লাহু আকবার! এ কেমন মহব্বত! আর কেনইবা এই মহব্বত ছালাতের প্রতি সকল সৎকর্মশীল বান্দাগণের? ছালাত প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি এক ঈর্ষণীয় অনুরাগের অনুপম ইতিহাস আমাদের জন্য রচনা করে গেলেন'।[১১]

উপরোক্ত ইতিহাস সমূহ আমাদের ছালাতের প্রতি আন্তরিক হবার আহ্বান জানায়। সাথে সাথে জানিয়ে দেয় ছালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা। এমনিভাবে কুরআন ও হাদীছের নির্দেশনা বলী এবং বর্ণনারীতি ছালাতের অপরিহার্যতা প্রকাশ করে। (ক্রমশঃ)

[লেখক: দাওরা ১ম বর্ষ, আল মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ: ৭৪১।*
৮. *নাসাঈ হা/৩৯৩৯; মিশকাত হা/৫২৬১।*
৯. *বুখারী হা/১৪০০; মিশকাত হা/১৭৯০।*
১০. *বুখারী হা/৭২৮৫, ১৪০০; মুসলিম হা/২০; তিরমিযী হা/ ২৬০৭; নাসাঈ হা/২৪৪৩।*
১১. *বুখারী হা/ ১৮৯০।*

কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর

-মিনারুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

(৫) আনুগত্যকারী :

আনুগত্য মুমিন ব্যক্তির একটি বিশেষ গুণ। আনুগত্য কারীগণকে আল্লাহ ভালবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্র ভালবাসা। সুতরাং সুখে-শান্তিতে, দুঃখে- কষ্টে, সচ্ছলতায় বা অসচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ তাঁর উম্মত হিসাবে মেনে চলা আমাদের একান্তই কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক *(হাশর ৫৯/৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য করা রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম *(নিসা ৪/৫৯)*।

এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تُطِيعُونِى قَالُوا بَلَى . قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ صلى الله بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ عليه وسلم فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠালেন এবং একজন আনছারীকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, নবী করীম (ছাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ জড় কর এবং তাতে আগুন জ্বালাও। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ জড় করল এবং তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করেছি। তাহ'লে কি আমরা (সবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও দমিত হয়ে যায়। এ ঘটনা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করা হ'লে তিনি বললেন, যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহ'লে কোনদিন আর এ থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবল বৈধ কাজেই হয়ে থাকে'।[১]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির আনুগত্যের মাধ্যমে তাগুতের পথে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে তার স্থান হবে জাহান্নাম। আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হওয়ার পরে কেন তারা পরাজয় বরণ করে। শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও দূরদর্শী সেনানায়ক রাসূল (ছাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই গিরিপথ দিয়েই শত্রুসেনারা প্রবেশ করতে পারে। এজন্য তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের আনসারীর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৫০ জন দক্ষ একটি তীরন্দায দলকে নিযুক্ত করেন। শত্রুপক্ষ যেন এই গিরিপথ দিয়ে আক্রমণ করতে না পারে। সে জন্য তিনি তীরন্দাযদেরকে লক্ষ্য করে কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী প্রদান করে বলেন, জয় বা পরাজয় যাই-ই হৌক তোমরা পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান ত্যাগ করবে না এবং শত্রুসেনারা যেন এ পথ দিয়ে কোন ভাবে প্রবেশ করতে না পারে। إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ، فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ،

১. *বুখারী হা/৭১৪৫; আহমাদ হা/১০১৮।*

وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ‘এমনকি তোমরা যদি আমাদের মৃত লাশে পক্ষীকুলকে ছোঁ মারতে দেখ, তবুও আমি তোমাদের কাছে কাউকে না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা ঐ স্থান পরিত্যাগ করবে না। যদি তোমরা দেখ যে, আমরা তাদেরকে পরাজিত করেছি এবং তাদের পদদলিত করছি, তথাপি তোমরা উক্ত স্থান ছেড়ে আসবে না। যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে কাউকে পাঠাই’।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সেনাদের অদম্য বীরত্বের সম্মুখে কাফির বাহিনী কচুকাটা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর রেখে যায় তাদের মালামাল। মুসলিম বাহিনী তাদের পরিত্যাক্ত মাল জমা করতে শুরু করে। তাদের মাল জমা করা দেখে তারা ‘গণীমত’ ‘গণীমত’ বলতে বলতে ময়দানের দিকে ছুটে চলল। দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের আনছারী (রাঃ) তাদেরকে বলেন, أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ ‘তোমরা কি ভুলে গেলে রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে কি বলেছিলেন? জবাবে তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই লোকদের সঙ্গে গণীমত কুড়াব’।[২]

মুসলিম বাহিনী যখন গণীমতের মাল কুড়ানোর জন্য ব্যস্ত। ঠিক এই মূহুর্তে শত্রুপক্ষের অশ্বরোহী বাহিনীর অতীব চতুর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ সুযোগ বুঝে নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ঐ ক্ষুদ্র বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও তার সাথীগণ সকলে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তার পশ্চাদবর্তী কুরায়েশ সেনাদল অতর্কিতভাবে এসে অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীর উপরে হামলা করল। ঐ সময় আমরাহ নাম্মী জনৈকা মহিলা এসে তাদের ভূলুণ্ঠিত পতাকা তুলে ধরলে চারদিক থেকে মাক্কী বাহিনী পুনরায় ময়দানে ছুটে আসে এবং অগ্র-পশ্চাৎ সবদিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। শুরু হয় মহা পরীক্ষা। নেমে আসে মহা বিপর্যয়।

আনুগত্যহীনতার এই ছোট্ট ভুলের জন্য মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে আসে মহা বিপর্যয়, যার কারণে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে ৭০ জন শহীদ ও ৪০ জন আহত হন। আর সে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় নিশ্চিতই ছিল, অথচ সামান্য ভুলের জন্য পরাজয় বরণ করেন। তাই নেতা যে পর্যায়েরই হোক না কেন সে যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা পরিচালনা করে তাহ’লে তার আনুগত্য করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا– ‘যদি তোমাদের উপর নাক, কান কাটা কালো গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় আর সে যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা পরিচালনা করে, তাহ’লে তার কথা শুনো ও তার আনুগত্য কর’।[৩]

২. *বুখারী/৩০৩৯।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২।*

(৬) মুমিনদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর :

মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হওয়া ও তাদেরকে ভালবাসা এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়া ঈমানের পূর্ণতার একটি অংশ। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ– আবু উমামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, আর আল্লাহ্র ওয়াস্তে কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তেই দান-খয়রাত করে, আবার আল্লাহ্র ওয়াস্তেই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকে। সে ঈমান পূর্ণ করেছে’।[৪] মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন হ’তে ফিরে যায়, (তাদের বদলে) অচিরেই আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে। যারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। বস্তুত আল্লহ প্রশস্ত দাতা ও সর্বজ্ঞ’ *(মায়েদাহ ৫/৫৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ‘হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। আর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা কতই না নিকৃষ্ট’ *(তাওবাহ ৯/৭৩)*।

অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হলে যেমন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তেমনিভাবে কাফেরদের প্রতি কঠোর হলেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তাঁর অনুসারী মুমিনদের সাথে নম্র ব্যবহার করার আদেশ করছেন। আল্লাহ মুশরিকের ব্যাপারে বলেন, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ‘অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হ’লে মুশরিকদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক’ *(তাওবাহ ৯/৫)*।

৪. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩০।*

আল্লাহ আহলে কিতাবদের ব্যাপারে বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ‘তোমরা জিহাদ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা তারা হারাম মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্মকে, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে *(তাওবাহ ৯/২৯)*।

আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন, جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ‘কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর’ *(তাওবাহ ৯/৭৩)*।

বিদ্রোহীদের (বিরুদ্ধে ব্যবহার করার) জন্য মহান আল্লাহ বলেন, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ‘তোমরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র হুকুমের দিকে ফিরে আসে’ *(হুজুরাত /৪৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘একজন মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য একটি দেহের ন্যায়’।[৫] একটি দেহের কোন এক অংশ যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে সারা শরীর ব্যথায় ব্যথিত হয়, তেমনি হ’ল সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ। রাসূলঃ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ‘এক মুমিন উপর এক মুমিন একটি বিল্ডিং-এর ন্যায়, সে একে উপরকে শক্তভাবে ধরে রাখে’।[৬] সুতরাং মুমিনদেরকে ভালোবাসা, দয়া করা ও বিনয়ী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন যায়।

(৭) তওবাকারী :

তওবা অর্থ ফিরে আসা, বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। মানুষ যেমন ভুলের উর্ধ্বে না, তেমন পাপেরও উর্ধ্বে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ছোট-বড় কোন না কোন পাপের জড়িত। হক্ব হ’ল দুই প্রকার ১. আল্লাহ্র হক্ব ২. বান্দার হক্ব। মানুষ এই দুই হক্ব নষ্ট করার কারণেই পাপী হয়ে থাকে। যেমন যেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, খুনাখুনি, মিথ্যা বলা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, চোগলখোরী করা, গালিগালাজ, আত্মসাৎ করা ইত্যাদি অপকর্মের সাথে জড়িত থাকা এবং ফরয ইবাদত থেকে বিমুখতার কারণে মানুষ পাপী হয়ে থাকে। মানুষ পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তারপরও আল্লাহ্র নিকটে তাওবা ও ক্ষমা চাইতে অভ্যস্ত না। অথচ তাওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপী আর সর্বোত্তম পাপী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ্র কাছে তাওবাহ করে’।[৭]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে বিমোহিত হয়ে মক্কার পাপী মুশরিক লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করত এবং তারা তাদের ব্যাভিচার ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কথা অকপটে স্বীকার করে নিত। তারা বলত, আপনি যা কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিকই খুবই উত্তম। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, এখন বলুন, আমরা যেসব পাপকার্য করেছি তার কাফফারা কিভাবে হ’তে পারে? তখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়। قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ‘বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(যুমার /৫৩)*।

নিজের কৃত পাপসমূহ আল্লাহ্র নিকটে উপস্থাপন করে নত শিরে ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র নিকটে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ! মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়’ *(তাহরীম ৬৬/৮)*। অত্র আয়াতে বিশুদ্ধ তওবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের উচিত হবে, কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করা, পরবর্তীতে উক্ত পাপে জড়িত না হওয়া এবং পাপের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র আল্লাহ্র নিকটে তওবা করা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ‘হে মানবমন্ডলী! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই আমি তার নিকট দিন একশত বার করে তওবা করি’।[৮]

অত্র হাদীছ শিক্ষা দেয় যে, যার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে তিনিও দৈনিক একশতবার করে তওবা করেছেন। আর আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাপে ভরপুর, এমনকি আমরা পাপের সাগরে হবুডুবু খাচ্ছি। তারপরও আমাদের হুঁশ ফিরেনা। তওবা করতে শিখিনি, ক্ষমা চাইতে জানিনা। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন।

(৮) পবিত্রতা অর্জনকারীগণ :

ত্বাহারাত হ’ল অর্থ পবিত্রতা। শরীরের বিশেষ অঙ্গসমূহকে কুরআন ও হাদীছের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ধৌত করার মাধ্যমে শরীর থেকে নাপাকী দূর করাই হ’ল ত্বাহারাত বা পবিত্রতা।

---

৫. মুসলিম/২৫৯৭।
৬. বুখারী /৪৮১।
৭. ইবনে মাজাহ/৪২৫১।
৮. মুসলিম হা/৭০৩৪।

পবিত্রতা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ। পবিত্র ও পরিপাটি না হলে মানুষ এবং পশুর মাঝে খুব বেশী একটা ফারাক থাকে না। মিসওয়াক করা, ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম পবিত্রতা অর্জনের একেকটি পথ ও পন্থা, যা ইসলাম মানবতাকে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই শিক্ষা দিয়েছে। আজকে মহামারী করোনার মধ্য দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারা ২/২২২)*। পবিত্রতা অর্জন করা ঈমানের একটি অঙ্গ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ 'পবিত্রতা হ'ল ঈমানের একটি অঙ্গ'।[৯]

বিশেষ করে মুমিন-মুসলমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হ'ল ছালাত, যা জান্নাতে যাওয়ার চাবি সমতুল্য। যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করে বান্দা মহান রবের সামনে দাঁড়াবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

ছালাতে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ নিজেকে ছালাতের জন্য প্রস্তুত করবে। মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মিসওয়াকের প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ 'যখন কোন মানুষ মিসওয়াক করে ছালাতে দাঁড়ায়। তখন একজন ফেরেশতাও তার পিছনে দাঁড়ায়। অতঃপর সে ব্যক্তিটির কুরআন তেলাওয়াত শুনার জন্য মুছল্লীর অনেক নিকটবর্তী হয়। এমনকি মুছল্লীর মুখ থেকে পঠিত কুরআন শুনার জন্য সে নিজের মুখ মুছল্লীর মুখের সাথে পেট অবধি লাগিয়ে দেয়। অতএব তোমরা (ছালাতে) কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মুখকে পরিচ্ছন্ন কর'।[১০]

অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে সঠিকভাবে ওযূ করা, ওযূর পরে দো'আ পড়া ইত্যাদি। ওযূ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মুসলিম ফরয ছালাতের সময় হ'লে উত্তমভাবে ওযূ করে, বিনয় ও ভয় সহকারে রুকু' করে ছালাত আদায় করে, তা তার উক্ত ছালাতের পূর্বেকার গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কাবীরাহ কবীরা গুনাহ করে। আর এভাবে সর্বদাই চলতে থাকবে'।[১১]

অপরপক্ষে পবিত্রতা অর্জনে অনীহা প্রদর্শন, বান্দাকে ভয়ানক শাস্তির মুখে ঠেলে দিতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, যা আল্লাহ তা'আলা (বান্দার জন্য) ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এ ছালাতের জন্য ভালোভাবে ওযূ করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকু' ও খুশু-খুযূকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিপালন করবে, তার জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন'।[১২]

কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। বরং তাদের একজন পেশাব হ'তে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একখানি গেড়ে দিলেন'।[১৩] (ক্রমশঃ)

[শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]-মি

৯. *মুসলিম হা/৫৫৬।*
১০. *বায়হাক্বী, বাযযার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩।*
১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬।*
১২. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৭০।*
১৩. *মুসলিম হা/১৩৬।*

আফগানিস্তান : আরেক সাম্রাজ্যবাদের পতন

-মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত

ভূমিকা : হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত একটি দেশ আফগানিস্তান। পর্বতমালা বেষ্টিত এ দেশটির সবচেয়ে বড় জাতি পশতুন, যাদেরকে আফগানীও বলা হয়। আপাত সরল ও নিরীহ এই মানুষগুলো আদতে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আফগানিস্তান অর্থ 'আফগানদের ভূমি'। তবে পশতুন ছাড়াও আরো অন্যান্য জাতি এখানে রয়েছে। আফগানীদের যুদ্ধের ইতিহাস নতুন নয়, বেশ পুরোনো। প্রাচীন কাল থেকে গোত্র শাসিত এ অঞ্চলের রীতি-নীতি নির্ধারণ করে এখানকার গোত্র নেতারা। আরবদের পর যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে লড়াকু এবং জেদী বলা যায় আফগানদের। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অনবরত লড়ে যাওয়ার ইতিহাস এদের বহু পুরোনো। যারাই এই ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করেছে, তারাই এখানে নাকানি-চুবানি খেয়েছে। দূর অতীতের আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট, চেঙ্গিস খান থেকে শুরু করে নিকট অতীতের ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সদ্য পরাজিত সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পতনের দিকে দৃষ্টি দিলেই এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বক্ষমান প্রবন্ধে আফগানদের হাতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত উল্লেখ করা হ'ল।

আফগানিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল : ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে আফগানিস্তানে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে এবং ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এখানে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ৯ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব পারস্য ও মধ্য এশিয়ার তুর্কীরা আফগানিস্তান শাসন করে। ১২১৯-২১ পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত মঙ্গলীয় বীর চেঙ্গিস খান এখানে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এখানকার কর্তৃত্ব নিয়ে পারস্য ও মোগল সম্রাটদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এরপর ১৭শ শতকের মাঝামাঝিতে দুর্রানী সম্রাট আহমাদ শাহ আবদালী প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানকে একটি সুসংগঠিত সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

১৮শ শতকের শুরুর দিক থেকে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে এবং ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আফগানিস্তানে সেনা পাঠায় (কার্যত আক্রমণ করে)। ব্রিটিশ আক্রমণে পলাতক শাসক দোস্ত মুহাম্মাদের ছেলে ওয়াযির আকবর খান ১৮৪২ সালে ব্রিটিশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, যা '১ম এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা পরাজিত হয়। বেশীরভাগ সেনাই মারা যায়। কথিত আছে, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মাত্র একজন বৃটিশ সৈন্য নাকি আফগানিস্তান থেকে ভারতে ফিরতে পেরেছিল। ১৮৭৮ সালে '২য় এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ' সংঘঠিত হয় এবং আফগানরা পরাজিত হয়। কিন্তু তবুও তারা আফগানিস্তানে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি। ব্রিটিশরা আফগান পররাষ্ট্র নীতি নিজেদের হাতে রেখে আমীর আব্দুর রহমানকে আফগানের শাসক হিসাবে মেনে নিতে সম্মত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে তৎকালীন আমীর আমানুল্লাহ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং '৩য় এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ' সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির পর ব্রিটেন ঐ একই সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্তানকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত ব্রিটেনের তৎকালীন বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত না গেলেও বহু চেষ্টায়ও আফগানিস্তানে তাদের সাম্রাজ্যবাদের সূর্য সফলভাবে উদয় হয় নি।

১৯২৬ সালে আমীর আমানুল্লাহ আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪৬ সালে আফগানিস্তান জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর দাউদ খান রাশিয়ার সম্মতিতে বিপ্লবের মাধ্যমে বাদশাহ যহির শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে আফগানিস্তানকে রাজতন্ত্র থেকে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেন এবং নিজে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল আফগানিস্তানে এক সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল হয়। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় দাউদ খানকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসে রাশিয়ার একান্ত অনুগত আফগান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নূর মুহাম্মাদ তারাকী। তারাকী ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ১৯৭৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাফিযুল্লাহ আমীন ক্ষমতা দখল করে এবং নূর মুহাম্মাদ তারাকী সংঘর্ষে নিহত হন। এরপর ১৯৭৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এর মাত্র দুই দিন পরে ২৭শে ডিসেম্বর আরো একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাফিযুল্লাহ আমীন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিহত হন এবং বারবাক কারমাল ক্ষমতা হাতে নেন। তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ লাখ ২০ হাযার সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করায়। পশ্চিমা ও মুসলিম বিশ্ব থেকে রাশিয়ার এই পদক্ষেপের নিন্দা জানানো হয় এবং আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার দাবী উত্থাপন করা হয়। কিন্তু উত্তরে রাশিয়া জানায়, 'হাযার হাযার সশস্ত্র বিদ্রোহী আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে। তাই কারমাল সরকারের অনুরোধে রাশিয়া বাধ্য হয়ে আফগানিস্তানে এসেছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্য একে রাশিয়ার

আগ্রাসন হিসাবে উল্লেখ করে। এসময় তৎকালীন বিশ্বের দুই বৃহৎ পরাশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠান্ডা যুদ্ধের (Cold War)-এর কেন্দ্র বনে যায় আফগানিস্তান। আমেরিকার পুঁজিবাদী নয়া সাম্রাজ্যের পথে সমাজতন্ত্র ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। তাই আমেরিকা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার পতন চাইছিল। আর আমেরিকার সেই আকাংক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ আসে আফগানিস্তানে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রক্সি যুদ্ধে (Proxy War) আফগান মুজাহিদরা সবচেয়ে সফলভাবে কাজে আসে। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় প্রচুর পরিমাণে মার্কিন অর্থ ও সামরিক সহায়তা আসতে থাকে আফগান মুজাহিদদের হাতে। আমেরিকার সাথে সমান তালে সঊদী আরবও সহায়তা পাঠাতে থাকে। পাকিস্তান কর্তৃক প্রশিক্ষিত মুজাহিদরা সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা তৎপরতা চালাতে আরম্ভ করে। এ সময় জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু তরুণ আরব, পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হ'তে আফগানিস্তানে আসতে থাকে। এসব যোদ্ধাদের মধ্যে বিন লাদেন ছিলেন অন্যতম একজন, যিনি সোভিয়েত বিরোধী জিহাদে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এদিকে ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট বারবাক কারমাল মস্কোয় নির্বাসিত হ'লে গোয়েন্দা প্রধান মুহাম্মাদ নাজিবুল্লাহ দেশের ক্ষমতা দখলে নেন। কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনগণের মন জয় করতে দেশকে ১৯৯০ সালে আফগানিস্তানকে সাংবিধানিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। অন্যদিকে মুজাহিদরা সোভিয়েত বাহিনীকে দেশছাড়া করার জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাতে থাকে। ফলে প্রবল আগ্রাসন চালানোর পরও একসময় মুজাহিদদের প্রতিরোধের মুখে রুশদের অবস্থা নাজেহাল হয়ে যায়। মুজাহিদরা রুশ হেলিকপ্টারগুলোকে পঙ্গপালের মতো ভূপাতিত করতে থাকে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ এই যুদ্ধের অসারতা বুঝতে পারেন। একদিকে রুশ সেনাদের ব্যর্থতা, অপর দিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে। গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্রান্তির কথা স্বীকার করেন এবং আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেন।

১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত বাহিনীর সর্বশেষ সৈন্যটিও আফগানিস্তান ত্যাগ করে। কিন্তু এই ভুল যুদ্ধে জড়ানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে মাশুল দিতে হয় খুব চড়া মূল্যে। কেননা এর মাধ্যমে শক্তিশালী বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদীদের পতন হয় এবং ১৫টি টুকরোতে বিভক্ত হয়ে যায়।

মুক্তিকামী তালিবানের উত্থান ও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পতন :

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদায়ের পর মুজাহিদরা আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য কাবুলের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। ১৯৯২ সালে মুজাহিদদের হাতে নাজিবুল্লাহ সরকারের (তথা সমাজতন্ত্রের) পতন হয়। কিন্তু এবার আফগানিস্তানে নিজেদের কর্তৃত্ব নিয়ে বিভিন্ন মুজাহিদ দলগুলোর মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায়। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। পুনরায় অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে আফগানিস্তান। এসময় আবির্ভূত হন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর ও তার অখ্যাত ছাত্র সংগঠন 'তালেবান' বা ছাত্রগণ। মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়েই মূলতঃ সংগঠনটি গঠিত হবার কারণে এই নাম দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে তালেবান কাবুল দখল করে এবং পরবর্তীতে মাজার-ই-শরীফ দখলের মাধ্যমে আফগানিস্তানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কাবুল দখলের পর বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে সঊদী আরব, আরব আমিরাত এবং পাকিস্তানের স্বীকৃতি নিয়ে আফগানিস্তান একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠনের পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু কয়েক বছরের মাথায় তাতে বাঁধ সাধে আরেক ঘটনা, যা আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতাকে ফের উল্টো দিকে প্রবাহিত করে।

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১, সকাল ৯টা। মঞ্চস্থ হয় বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ পাল্টে দেওয়া বিস্ময়কর ৯/১১-এর হামলা। বিশ্ববাসীকে বাকরুদ্ধ করে দিয়ে নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের জোড়া টাওয়ার (Twin Tower) ও আমেরিকার প্রতিরক্ষা সদর দফতর পেন্টাগনে ছিনতাই করা যাত্রীবাহী বিমান দ্বারা অচিন্তনীয়ভাবে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। টুইন টাওয়ার বিমানে রক্ষিত ৬০,০০০ গ্যালন জ্বালানি তেলের বিস্ফোরণের কারণে বিকট আওয়াজে

মুহূর্তেই ভূপাতিত হয়। দণ্ডায়মান থাকে স্রেফ লোহার ফ্রেমটুকু। অপ্রত্যাশিত হলেও 'America Under Attack' শিরোনামে BBC হামলার সংবাদ প্রচার করে। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, খোদ মার্কিন মুলুক থেকে এতো বড় হামলা করা হলেও এর কোন পূর্বাভাস বা তথ্য পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ছিল না। মার্কিন প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এ হামলার সাথে ওসামা বিন লাদেনের সম্পৃক্ততার দাবী করেন এবং প্রতিশোধ নেবার ঘোষণা দেন। এদিকে ১১-২৪ সেপ্টেম্বর- এই ১৩ দিনের মধ্যে বিন লাদেনের ওয়েবসাইট থেকে চার বার ঘোষণা আসে যে, তিনি ও তার সংগঠন এই

হামলার সাথে জড়িত নন'।[১]

কিন্তু এ কথায় কোন কর্ণপাত করা হয়নি, বরং জর্জ বুশ বলেন, শত্রুদের তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষ করবেন। এরপর মাত্র ২৮ দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট বুশ 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা করেন এবং বিন লাদেনকে আশ্রয় ও সন্ত্রাসবাদে মদদ দেবার অভিযোগ তুলে ন্যাটো জোটকে সাথে নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড আক্রমণে তালেবান প্রশাসন পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং বিভিন্ন গোত্রীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। দুই মাসের মধ্যে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন হয় এবং মার্কিন সমর্থিত পুতুল সরকার ক্ষমতায় আসে। তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া পাকিস্তান বনে যায় আমেরিকার বিশ্বস্ত মিত্র। ওয়াশিংটনের নির্দেশে পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে তালেবানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে। এভাবে War on Terror তথা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নামে আমেরিকা আফগানে একতরফাভাবে শুরু করেছিল এক অসম রক্তক্ষয়ী লড়াই এবং এর আড়ালে সমগ্র মুসলিম জাতিকে বানিয়েছিল সন্ত্রাসী।

১৯৯৩ সালে Foreign Affairs জার্নালে 'The Clash of Civilizations' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। যার তাত্ত্বিক ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Samuel P. Huntington। উক্ত প্রবন্ধে তিনি দাবী করেন, আগামী দিনে পৃথিবীতে যুদ্ধ বা সংঘাতগুলো হবে সভ্যতা কেন্দ্রিক। তিনি পৃথিবীকে মোট ৭টি মৌলিক সভ্যতায় বিভক্ত করেন এবং আমেরিকাকে এই বার্তা দেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি আসবে ইসলামী সভ্যতার দিক থেকে। তিনি ইসলামকে একটি 'সভ্যতা' হিসাবে বিবেচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের পরই গোটা বিশ্ব জুড়ে আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যেতে শুরু করে। বাংলাদেশে এই তত্ত্বের একজন কট্টর সমালোচক হলেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। তিনি হান্টিংটনের এই গবেষণা প্রবন্ধকে ডাস্টবিনে ফেলারও অযোগ্য বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর পরের বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে কাকতালীয়ভাবে হান্টিংটনের তত্ত্বের সাথে ঘটনা প্রবাহের ব্যাপক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং একুশ শতকে এই সংঘাতের সূচনা হয়েছিল আমেরিকার আফগান আক্রমণের মধ্য দিয়ে। যা সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র নিছক ধারণা প্রসূত একটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।

দিনে দিনে বিশ্ব রাজনীতি ও আফগান পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। অবশেষে ২০০৫ সালে বিচ্ছিন্ন তালেবান যোদ্ধারা পুনরায় সংগঠিত হ'তে শুরু করে। তারা প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং একই সাল হ'তে তারা মার্কিন ও তাদের মিত্র বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাতে শুরু করে। দৈনিক নয়াদিগন্ত জানায়, 'বর্তমানে (২০০৫) আফগানিস্তানে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতি ইরাককেও ছাড়িয়ে গেছে। তালেবান মুখপাত্র বলেন, বিদেশী সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ না করা পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো জানান, তালেবান যোদ্ধারা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মোল্লা ওমর তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন। গত তিন মাসে দু'টি মার্কিন কপ্টার ভূপাতিত হয়েছে। যোদ্ধাদের রণকৌশলে মার্কিন বাহিনী অবাক। তাদের দক্ষতা ইরাকীদের চাইতেও সুনিপুণ'।[২] পাকিস্তানি সাংবাদিক সাইয়েদ সেলিম শেহজাদের মতে, তালেবান বড় মাপের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে পরের বছর ২০০৬ সাল থেকে। সময় এগোনোর সাথে সাথে তালেবানরা আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে দখল নিতে থাকে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত এ যুদ্ধের এক দশকের মাথায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনাকালে আমেরিকা বুঝতে পারে যুদ্ধের মোড় তার অনুকূলে যাচ্ছে না। কিন্তু তবুও আমেরিকা বিশ্বের সামনে নিজের সুপার পাওয়ার ইমেজ ধরে রাখার জন্য একের পর এক হামলা চালিয়ে যায়। টনের পর টন বোমা ফেলে পুরো দেশকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। এসব হামলার শিকার হয় হাযার হাযার নারী, শিশু ও বেসামরিক নাগরিক। কিন্তু তবুও আমেরিকার শেষ রক্ষা হয়নি। রাশিয়ার অনুরূপ ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সামরিক ব্যর্থতা

১. *মাসিক আত তাহরীক, জুন ২০১১।*

২. *নয়া দিগন্ত, ৬ জুন ২০০৫।*

আমেরিকাকে থামতে বাধ্য করে। খোদ মার্কিন সরকারের হিসাব বলছে, 'আফগান যুদ্ধে সব মিলিয়ে ২০০১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৮২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। কিন্তু এতে পাকিস্তানে যে ব্যয় হয়েছে তার হিসাব ধরা হয়নি'।[৩] প্রকৃত হিসাবে যদিও আরো বেশী। এতো ব্যাপক ক্ষতির মুখে আমেরিকা আফগান ত্যাগ করার পথ খুঁজতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু তালেবানের সাথে আপোষ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ তাদের সামনে ছিল না। তাই এক রকম বাধ্য হয়েই আমেরিকা সে পথে হাঁটে।

২০২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী কাতারের রাজধানী দোহায় স্বাক্ষরিত হয় 'মার্কিন-তালেবান' ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, আমেরিকা ১৪ মাসের মধ্যে মার্কিন ও ন্যাটো জোটের সব সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য থাকবে। পরবর্তীতে আমেরিকার নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ১১ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে পুরোপুরি সৈন্য প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেন'।[৪] বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হওয়ার সাথে সাথে ঝড়ের গতিতে তালেবানরা আফগানিস্তানে একের পর এক অঞ্চল দখল করতে থাকে। মার্কিন প্রশিক্ষিত আফগান সরকারী বাহিনী বিভিন্ন সময়ে তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও দেশ ত্যাগ করে পালাতে থাকে। অবশেষে প্রায় ২০ বছর পর গত ১৫ই আগস্ট তালেবান পুনরায় কাবুল দখল করে এবং প্রেসিডেন্ট প্যালেসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

কথিত সন্ত্রাস দমনের নামে এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ে যুদ্ধে নামা ছিল আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। আফগান থেকে এই লজ্জাজনক প্রত্যাবর্তনের পর সোভিয়েত রাশিয়ার মতো মার্কিন সাম্রাজ্যকেও ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে বাঁচানো আমেরিকার জন্য আরেকটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আফগানিস্তানে তাদের পরাজয় জানিয়ে দিচ্ছে যে, ক্ষয়িষ্ণু হ'তে শুরু করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জাল। আমেরিকার পতন একথা আমাদের জানান দেয় যে, 'আপনি যদি আফগানে প্রবেশ চান তাহ'লে সেটা বেশ সহজ। কিন্তু যখন বেরিয়ে আসতে চাইবেন তখন সেটা খুব কঠিন হয়ে যাবে'। যে কথাটি মূলত বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট-এর। এটা তিনি বলেছিলেন দখলদারদের উদ্দেশ্য। মঙ্গল, ব্রিটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পর আফগানের মাটিতে আমেরিকার পরাজয় যেন সেই কথারই সাক্ষ্য দেয়।

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ :

তালেবানের কাবুল দখলের পর সেখানকার জনগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। বিমানে গাদাগাদি করে দেশ ত্যাগ করার তোড়জোড় শুরু করেন অনেকে। কিন্তু কাবুল দখলের পর তালেবান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। কাবুল দখলের পর তালেবানের প্রথম সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তালেবান মুখপাত্র যবীহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, '২০ বছর সংগ্রাম করে আমরা দেশকে মুক্ত করেছি এবং বিদেশীদের বহিষ্কার করেছি। গোটা জাতির জন্য এটা গর্বের মুহূর্ত'।[৫]

তালেবানের কাবুল দখলের পর চীনা পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, 'আফগানিস্তানের জনগণের ইচ্ছা ও পসন্দকে চীন সম্মান করে'। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান 'আফগানরা দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গেছে' বলে মন্তব্য করেন।

ভবিষ্যতে আফগানিস্তানকে কিভাবে পরিচালনা করা হবে, এ প্রশ্নের জবাবে ওয়াহিদুল্লাহ হাশিমী বলেন, 'এখানে কোন রকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকবে না। কারণ আমাদের দেশে এর কোনো ভিত্তি নেই। আফগানরা যেহেতু শতভাগ মুসলিম তাই এখানে ইসলামী শারঈ আইন বলবৎ থাকবে। সেটাই শেষ কথা'।[৬] আফগানের ভূমি ব্যবহার করে অন্য কোনো দেশের উপর কোনো সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না বলেও তারা বিশ্বকে আশ্বস্ত করে। মিডিয়ার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হ'ল, ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী কিছুই তারা মিডিয়ায় প্রচার করতে দেবে না'।[৭] আফগান নারীদের ব্যাপারে তাদের নীতি কি হবে? এ ব্যাপারে যবীহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, 'আমরা নারীদের বাইরে কাজ করার ও পড়াশোনার অনুমতি দেব। তবে সেটা হবে আমাদের কাঠামোর মধ্যে। শারঈ আইনের অধীনে নারীর অধিকার রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।[৮]

উপসংহার : আফগানিস্তানের এই পরিবর্তন নিয়ে পুরো বিশ্ব উদ্বিগ্ন। এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতাগণ। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন করে নীতি নির্ধারণ করছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এখনো পূর্ণ স্থিতিশীল নয়। কাজেই আফগানিস্তান নতুন কোন গন্তব্যে যাত্রা শুরু করবে, তা এখনি নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসে নি। সে জন্য আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আফগানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করি। তাদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। আশাকরি যে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নিয়ে তারা আবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়েছে, তা তারা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। ইসলামে সাম্য ও ন্যায়বিচারের বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেবে। তবেই তাদের এই দীর্ঘ আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম স্বার্থক হবে।

[লেখক : বড়পই, প্রসাদপুর, মান্দা, নওগাঁ]

---

৩. বিবিসি, ১ মার্চ ২০২০।
৪. বিবিসি, ২ জুলাই ২০২১।
৫. বিবিসি, ১৭ আগস্ট ২০২১।
৬. বিবিসি, ১৮ আগস্ট ২০২১।
৭. বিবিসি, ১৭ আগস্ট ২০২১।
৮. বিবিসি, ১৭ আগস্ট ২০২১।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

ভূমিকা : মানুষের জীবনধারার উপর নির্ভর করে একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে উঠে। জাতিগত ভিন্নতার কারণে সংস্কৃতির ভিন্নতা দেখা যায়। আবার ভূ-রাজনৈতিক কোন্দলে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করলে সাহিত্য-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আরবী, হিন্দী, আফগানী ও সর্বশেষ ইংরেজরা এ বিশাল ভূখণ্ড শাসন করার কারণে বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে এ সমস্ত জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপাদান অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন- আফগানীদের মাধ্যমে ধর্মে হানাফী ও শিয়া মাযহাব এবং তাদের ভাষা ফার্সী হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপক ফার্সী শব্দ ঢুকে পড়েছে। অপরদিকে হিন্দু ও ইংরেজদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। যে কোন ভাষার প্রবাদ-প্রবচন সে অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। শুধু লোকসংস্কৃতি নয় বরং মূল সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও অংশ। দূর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হ'ল, বাংলাদেশের জনসমষ্টি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ওপার বাংলার হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির ছোঁয়ায় এদেশের ভাষা-সাহিত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিন্দু ধর্মীয় আক্বীদা মিশে গেমে, যা কিনা মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আলোচ্য প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত অনুরূপ কিছু প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো, যা আমাদের ইসলামী চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হ'লেও অবচেতন মনে তা হরহামেশা ব্যবহার করে থাকি।

প্রবাদের সংজ্ঞা : 'প্রবাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরম্পরাগত বাক্য, লোককথা, জনশ্রুতি। যে সব প্রাজ্ঞ উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে, তা-ই প্রবাদ। প্রবাদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'A proverb is a saying, usually short, that expresses a general truth about life.' অর্থাৎ প্রবাদ হ'ল সংক্ষিপ্ত একটি উক্তি, যা জীবন সম্পর্কে সাধারণ কোন সত্যকে ব্যক্ত করে। পণ্ডিত আর্চার টেলর বলেন, 'A proverb is a terse didactic statement that is current in tradition or, as an epigram says, the wisdom of many and the wit of one.' অর্থাৎ প্রবাদ হ'ল প্রচলিত ঐতিহ্যগত নীতিশিক্ষামূলক সংক্ষিপ্ত উক্তি অথবা যেমনটি একটি সরস ক্ষুদ্র কবিতায় বলা হয়েছে, এটা হ'ল বহুজনের প্রজ্ঞা ও একজনের বুদ্ধিদীপ্ততার প্রকাশ'।[১]

সুতরাং প্রবাদ বলতে এমন কতক বাক্যাংশকে বোঝায়, যা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বহু বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ সংক্ষিপ্ত কথন, যে কথনের আড়ালে শিক্ষামূলক নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান এবং তা দ্বারা মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রবচন প্রবাদের সমার্থক শব্দ। শব্দগত দিক থেকে প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বাক্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রবাদ রূপক অর্থবোধক কিন্তু প্রবচনের শাব্দিক অর্থ রয়েছে। এ উভয় প্রকারই বাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত।

হিন্দুদের পূরাণ, মহাভারত ও রামায়ণের নানা ঘটনা থেকে অনেক প্রবাদের জন্ম। এ পর্বে মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রবাদের জন্ম হয়েছে সেগুলো উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? : 'মহাভারত' হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুরা গ্রন্থটিকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করলেও মূলত এটি ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গুপ্ত যুগে ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসদেব কর্তৃক লিখিত বলে দাবী করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত আঠারো পর্বের লক্ষাধিক শ্লোক ও গদ্যাংশ সমৃদ্ধ 'ভরত' নামক রাজার রাজবংশের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে বলে একে মহাভারত বলা হয়। এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় কৌরব ও পাণ্ডব বংশের মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধ।[২] উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সম্পূরক বহু কাল্পনিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেজন্য গ্রন্থটি আদৌ ধর্মগ্রন্থ নাকি রূপকথাভিত্তিক কাব্যগ্রন্থ তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। আমরা কথা প্রসঙ্গে রাগ কিংবা অভিমানে প্রায়শ বলি 'তুমি আসলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?' অর্থাৎ তোমার আসার কারণে মহাভারতের মত পবিত্র কিতাব অশুদ্ধ হয়ে তো ধর্ম নষ্ট হবে না। অর্থাৎ বিরাট ক্ষতি হয়ে যাওয়া বোঝাতে আমরা প্রবাদটি ব্যবহার করি। এই প্রবাদটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকারান্তরে আমরা যেন মহাভারতকেই শুদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবেই সমর্থন দিচ্ছি। অথচ খোদ হিন্দু পণ্ডিতরাই গ্রন্থটির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা বা এর ধর্মীয় মর্যাদা নিয়ে সন্দিহান। সেখানে মুসলিমদের মহাভারতের উপমা ব্যবহার করা অবশ্যই চরম অজ্ঞতা পরিচায়ক। আর ইসলামী আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক তো বটেই।

(২) ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা : দেবব্রত ভীষ্ম মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। কুরু বংশের পঞ্চম পুরুষ ভীষ্মের পিতা হস্তিনাপুর (হিন্দুদের মতে, বর্তমান দিল্লি)

১. *বাংলার প্রবাদ, ড. সুশীলকুমার দে (পত্র ভারতী প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ১ম সংস্করণ) ১-২ পৃ.।*

২. *https://bn.wikipedia.org/wiki/mahabharat.*

রাজা শান্তনু এবং মাতা দেবী গঙ্গা (ভারতের গঙ্গা নদীর দেবী)। ভীষ্ম তাদের একমাত্র জীবিত অষ্টম সন্তান। ভীষ্ম শিক্ষা-দীক্ষা ও অস্ত্র বিদ্যায় তৎকালীন সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। রাজা শান্তনু ভীষ্মকে যুবরাজ পদে বহাল করেন। তার চার বছর পরে একদিন শান্তনু বনে ঘুরতে গিয়ে যমুনার তীরে রাজা উপরিচরের কন্যা সত্যবতীকে পেয়ে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সত্যবতীর পিতা শর্ত দেন যে, যদি তার কন্যার গর্ভজাত পুত্র সন্তানকে পরবর্তীতে রাজা করার প্রতিশ্রুতি দেন, তবেই তিনি বিবাহ দিবেন। শান্তনু এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজ্যে ফিরে আসেন। কারণ নিয়মানুযায়ী যুবরাজ দেবব্রতের বংশধররাই পরবর্তীতে রাজা হওয়ার অধিকার রাখে। দেবব্রত বিষয়টি জানতে পেরে সত্যবতীর পালিত পিতা দাসরাজের কাছে যান। পিতার প্রতি পরম ভক্তির কারণে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে মৃত্যু অবধি কখনো রাজ্য দাবি করবে না এবং বিবাহ করবে না। এই আত্মত্যাগের জন্য শান্তনু ভীষ্মকে ইচ্ছা মৃত্যুর বর প্রদান করেন'।[৩] পরবর্তীতে শান্তনুর সাথে সত্যবতীর বিয়ে হয় এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্ম লাভ করে'।[৪] ভীষ্মের এই প্রতিশ্রুতি ইতিহাসে 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' হিসাবে প্রসিদ্ধি পায়। এই ঘটনার কারণে কঠিন পণ বা প্রতিজ্ঞা বোঝাতে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রবাদটি চালু হয়।

শিখণ্ডী খাড়া করা : এ প্রবাদটির অর্থ যার আড়াল থেকে মন্দ কাজ করা যায়। এ প্রবাদের পেছনেও মহাভারতে বর্ণিত লম্বা কাহিনী রয়েছে। সেটা হ'ল- ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তার সৎ ভাই চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসায়। কিন্তু কিছুকাল পরেই এক যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। এরপর চিত্রাঙ্গদের ছোট ভাই বিচিত্রবীর্য রাজা হয়। একবার কাশী রাজ্যের রাজা তাঁর তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকাকে পাত্রস্থ করার জন্য স্বয়ংবর[৫] সভার আয়োজন করেছিলেন। ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য সে সভায় গেলে তাকে অপমান করা হয়। এতে সে রাগান্বিত হয়ে কাশী রাজের তিন কন্যাকে জোর পূর্বক অপহরণ করে। অতঃপর অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে বিচিত্রবীর্যের বিয়ে হয়। কিন্তু বড় কন্যা অম্বা পিতাকে না জানিয়ে স্বয়ংবরের পূর্বেই শাল্ব দেশের রাজাকে বিবাহ করে। অম্বা ভীষ্মকে বিষয়টি জানালে তাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেয়'।[৬]

কিন্তু শাল্ব আর তাকে গ্রহণ করে না। অপরদিকে ভীষ্ম চিরকুমার থাকবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন বিধায় অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করে। অপমানিত অম্বা ভীষ্মকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে দেবতা শীবের তপস্যা করে। শীব জানায় যেদিন ভীষ্মের মনে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে, সেদিন অম্বা তার মৃত্যুর কারণ হবে। এই বর পাবার পর অম্বা আগুনে ঝাপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। পরজন্মে (হিন্দুরা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করা যায়। একেই পরজন্ম বলা হয়।) সে পাঞ্চাল দেশের (মনে করা হয় ভারতের উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ জুড়ে পাঞ্চাল দেশ ছিল) রাজা দ্রুপদের ঘরে শিখণ্ডিণী নামে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে পুরুষ লিঙ্গ গ্রহণ করে শিখণ্ডী নাম ধারণ করে। সে গল্পও অল্প বিস্তর নয়! যাইহোক মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুন (ভীষ্মের নাতি) বৃদ্ধ ভীষ্মের বীরত্বে পেরে উঠতে না পেরে দেবতা কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে দাঁড় করায়। যৌবনে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কোন নারীর উপর অস্ত্র উঠাবে না। সে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে শিখণ্ডীকে পূর্বজন্মের অম্বা ভেবে অস্ত্র ত্যাগ করে। ঠিক সে মুহূর্তে অর্জুনের ছুড়া তীরের আঘাতে ভীষ্ম ধরাশায়ী হয়'।[৭]

এ ঘটনার আলোকে 'শিখণ্ডী খাড়া করা' বলতে অন্যায় কাজ করার জন্য কাউকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা বোঝানো হয়।

অকাল কুষ্মাণ্ড : বাংলা অভিধান অনুযায়ী সংস্কৃত শব্দ কুষ্মাণ্ড অর্থ কুমড়া। অকাল কুষ্মাণ্ড অর্থ অসময়ে জন্ম নেওয়া কুমড়া অর্থাৎ অকেজো, অপদার্থ বা অযোগ্য ব্যক্তি। এ প্রবাদটির পেছনের গল্প মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্জধনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুর্জধন ধৃতরাষ্ট্রের বড় সন্তান। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র'।[৮] গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারীর সাথে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয় এবং কুন্তিভোজের রাজকন্যা কুন্তির সাথে পাণ্ডুর বিবাহ হয়। যৌবনে গান্ধারী দেবতা শিবের কাছ থেকে শত পুত্রের বর পেয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে দুই বছর অতিক্রম হলেও গর্ভবতী গান্ধারীর কোন সন্তান হয় না। অপরদিকে কুন্তির প্রথম সন্তান যুধিষ্ঠিরের জন্ম হলে হিংসায় গান্ধারী নিজ পেটে আঘাত করে গর্ভপাত ঘটায়। গর্ভপাতে লোহার মত শক্ত একটি মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আসে। গান্ধারী রাগে সে মাংসপিণ্ড ফেলে দিতে উদ্যত হয়। এমন সময় ঋষি ব্যাস আবির্ভূত হয়ে সে মাংসপিণ্ডটি একশত খণ্ড করে ঘিয়ে পরিপূর্ণ (সম্ভবত কুমড়া সদৃশ) পাত্রে রেখে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তার এক বছর পরে গান্ধারীর প্রথম সন্তান দুর্জধন, দুঃশলা নামে এক কন্যা

---

৩. বাংলা অভিধান অনুযায়ী বর অর্থ অলৌকিক উৎস থেকে ক্ষমতা লাভ। বরদান অর্থ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা। ইচ্ছা মৃত্যুর বর দান বলতে ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী মারা যাওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা বোঝায়। হিন্দু ধর্মে ঋষি, দেবতা ও পুণ্যবান ব্যক্তি বরদান প্রদান করেন।

৪. মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ (কলকাতা- ৭০০০৭৩, ১৩তম মুদ্রণ : ১৪১৮ বাংলা), আদিপর্ব, ৪০-৪২ পৃ.।

৫. যে অনুষ্ঠানে রাজকন্যা বিভিন্ন দেশের রাজা অথবা রাজকুমারদের মধ্য থেকে একজনকে পছন্দ করে বর মালা পরিয়ে বিবাহ করে তাকে স্বয়ংবর বলে।

৬. মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, আদিপর্ব, ৪২-৪৩ পৃ.।

৭. মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, ভীষ্ম পর্ব, ৪০৩-৪০৬ পৃ.।

৮. এরা বিচিত্রবীর্যের ঔরসজাত নয়। সন্তান জন্মের আগেই বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। বংশ রক্ষার্থে তার মাতা সত্যবতীর বিবাহ বর্হিভূত সন্তান মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হত (মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, আদিপর্ব, ৪২-৪৩, ৪৮ পৃ.)।

এবং নিরানব্বই পুত্র পরপর জন্মগ্রহণ করে। ধৃতরাষ্ট্রের এ শত পুত্রের বংশকে কৌরব বলা হয়। মহাভারতের যুদ্ধে দুর্জধন পাণ্ডু পুত্রদের সাথে লড়াই করে নিজের বংশকে ধ্বংস করে। এ কারণে দুর্জধনকে অকালকুষ্মাণ্ড বা অপদার্থ বলা হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে 'অকালকুষ্মাণ্ড' প্রবাদটি সমাজে প্রচলিত হয়'।[৯]

সূর্যসন্তান : কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তি যৌবনে ঋষি দূর্বাসার পরিচর্যা করায় দূর্বাসা মুনি খুশি হয়ে একটি মন্ত্র শিক্ষা দেন। যে মন্ত্রের মাধ্যমে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে সে দেবতার দ্বারা সন্তান লাভ হবে। কুন্তি একদিন কৌতুহলবশত মন্ত্র পাঠ করে সূর্য দেবতাকে আহবান করে। এতে সূর্যদেবতার ঔরসে কর্ণ নামে এক সন্তানের জন্ম হয়। কুন্তি সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে নবজাতক সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই সন্তান হস্তিনাপুরের রাজ সারথী অধিরথের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়। অতঃপর বিষ্ণুর ৬ষ্ঠ অবতার[১০] পরশুরামের কাছে নিজের পরিচয় গোপন করে অস্ত্র বিদ্যা লাভ করে। কর্ণ স্বীয় প্রতিভাবলে বীরত্বে মহাভারতে খ্যাতি অর্জন করেছিল'।[১১] সে সময়ে রথচালকদের তথা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যান্য নিচু জাতের মানুষদের অস্ত্র শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল এবং সামাজিকভাবে তাদের হেয় করা হত। কর্ণ সে সমাজে বড় হয়েছিল বিধায় সামাজিক জাত বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সারাজীবন সংগ্রাম করেছে। সেখান থেকেই মহাভারতের এই প্রবাদ পুরুষের বীরত্বকে উপজীব্য করে বর্তমান সময়ে সম্মানীত ব্যক্তিদের প্রশংসায় 'সূর্য সন্তান' প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির : রাজা পাণ্ডু তার দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে বনে হরিণ শিকারে যায়। সেখানে কিমিন্দম মুনির অভিশাপে রাজা পাণ্ডু সন্তান জন্মদানে বাধাপ্রাপ্ত হয়'।[১২] সে সময় পাণ্ডু কুন্তিকে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করে সন্তান উৎপাদনের অনুমতি দেয়। কুন্তি দেবতা ধর্মকে আহ্বান করে। দেবতা ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। এ কারণে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র বলা হয়। যুধিষ্ঠির তাদের ধর্ম দেবতার মতই অত্যন্ত ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ ও পরম সত্যবাদী ছিল। সেজন্য আমাদের সমাজে অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি বোঝাতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির উপমাটি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও কপট ব্যক্তি ধার্মিক লেবাস পরে ধার্মিকতা জাহির করলে তাকেও ব্যঙ্গ করে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলা হয়।

শকুনি মামা : শকুনি গান্ধার রাজ। সুবলের পুত্র এবং দুর্জধনের মামা। দুর্জধনের পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিল বলে তার মাতা গান্ধারীও চোখে কাপড় বেঁধে মৃত্যু অবধি স্বামীর সাথে অন্ধ থাকার পণ করে। এতে শকুনি প্রতিশোধ নিতে গান্ধার ছেড়ে হস্তিনাপুরে বোন-ভগ্নিপতির রাজ্যে পড়ে থাকতো। শকুনি অত্যন্ত ধূর্ত, অসৎ ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। তার প্ররোচনাতেই কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের বংশ সমূলে নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য কূটবুদ্ধি দিয়ে নিজ আত্মীয়ের মধ্যে গৃহবিবাদ বাধানো ব্যক্তিকে 'শকুনি মামা' বা নির্মম আত্মীয় বলা হয়।

কুরুক্ষেত্র কাণ্ড : ধারণা করা হয় কুরু ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে অবস্থিত। কৌরব ও পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ রাজা কুরু উক্ত জায়গায় লাঙ্গল চাষ করতেন। তিনি বর পেয়েছিলেন যে, এ স্থানে মৃত্যুবরণকারী কিংবা তপস্যাকারী ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গে যাবে। সেই থেকে জায়গাটি কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত। এখানেই কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে মহাভারতের তুমুল সংঘর্ষ হয়। সেজন্য মহাকলহ, ভীষণ যুদ্ধ বা ঝগড়াঝাটি বোঝাতে 'কুরুক্ষেত্র কাণ্ড' প্রবাদটি ব্যবহার হয়।[১৩]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

৯. *প্রবাদ সংগ্রহ, শ্রীকানাই লাল ঘোষাল, ১৪ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা- ১৮৯০ খ্রীঃ, ৫ পৃ।*

১০. *হিন্দু ধর্মে কোন দেবতা মানুষ রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে জন্ম নিলে তাকে অবতার বলা হয়।*

১১. *মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, আদিপর্ব, ৪৭ পৃ.।*

১২. *পাণ্ডু বনে মিলনরত একটি পুরুষ হরিণকে হত্যা করে। ঐ হরিণ দম্পতি ঋষি কিমিন্দম এবং তার স্ত্রী ছিল। সন্তান লাভের আশায় তারা হরিণ রূপ ধারণ করেছিল। ঋষি মৃত্যুর পূর্বে পাণ্ডুকে অভিশাপ দেয় যে, তুমিও যখন স্ত্রীর কাছে মিলনের আশায় যাবে তখনি তোমার মৃত্যু হবে। পরবর্তীতে কাম ভাব নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীর কাছে যাওয়ায় পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে দেবতা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পরে পবনদেব ও দেবরাজ ইন্দ্রের মাধ্যমে যথাক্রমে ভীম ও অর্জুনের জন্ম হয়। পাণ্ডুর অপর স্ত্রী মাদ্রী একই পদ্ধতিতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্রের জন্ম দেয়। এদেরকেই পঞ্চ পাণ্ডব বলা হয়। এদের বংশই পাণ্ডব বংশ। মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, আদিপর্ব, ৫০-৫১ পৃ.।*

১৩. *প্রবাদের উৎস সন্ধান, সমর পাল (৩য় প্রকাশ : ২০১৬), ৪৯-৫০ পৃ.।*

ইসলামের প্রথম সমাচার

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

(২য় কিস্তি)

প্রথম তওবা : হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় ভুল করার পর প্রথম তওবা করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাদের ভুল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ 'আমি কি এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদের একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?*(আরাফ ৭/২২)*।

এরপর তারা যা করেছিলেন, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ 'অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার নিকট হ'তে কিছু কথা শিখে নিল' *(বাক্বারাহ ২/৩৭)*। অতঃফর অনুতপ্ত হয়ে চমৎকার একটি দো'আ মহান প্রভুর কাছে করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

এরপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করে তাদের ক্ষমা করে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 'অতঃপর তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়' *(বাক্বারাহ ২/৩৭)*।[১]

প্রথম খাৎনা : মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম নিজের খাৎনা নিজে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ 'ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সের পর কাদুম নামক স্থানে নিজেই নিজের খাৎনা করেন'।[২]

প্রথম মেহমানদারী : মহৎ গুণসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম একটি গুণ হ'ল- মেহমানদারিতা। আর এই মহৎ কাজটি প্রথম কে করেছিলেন সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أول من أضاف الضَّيْف إِبْرَاهِيم 'প্রথম মেহমানদারী করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)'।[৩]

মক্কায় প্রথম বসতি স্থাপন : মক্কায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন মা হাযেরা এবং পুত্র ইসমাঈল (আঃ)। বুখারীর দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, ...ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহ'লে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পরিণত হ'ত। রাবী বলেন, তারপর হাযেরা (আঃ) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহ্র ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে এখানে ঘর নির্মাণ করবেন এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহ্র ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তাঁর ডানে-বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা (আঃ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভুমির পথ ধরে এদিক আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হ'ল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইবনু আব্বাস(রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হ'ল।[৪]

---

১. *হাকেম হা/২৫৪৫; তাফসীরে তাবারী ১/২৪৩ পৃ.; তারিখে ইবনু আসাকির ৭/৪৩৩ পৃ:।*
২. *বুখারী হা/৩৩৫৬; মুসলিম হা/২৩৭০; মিশকাত হা/৫৭০৩।*
৩. *মুয়াত্তা হা/৯২২; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৫১।*
৪. *বুখারী হা/৩১৮৪; নাসাঈকুবরা ৮৩৭৯; আব্দুর রাযযাক হা/৯১০৭; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১৫৪।*

প্রথম বৃদ্ধ : ইবরাহীম (আঃ)

ইসমাঈল বিন আয়াশ বলেন, প্রথম বৃদ্ধ হয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তিনি যখন তার শুভ্রতা দেখলেন তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এটা কি? তখন আল্লাহ বলেন, এটা وَقَارٌ (ওয়াকার) 'মর্যাদা'। এরপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ আপনি আমার 'ওয়াকার' মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন'।[৫] তিনি তাঁর সর্বপ্রথম শুভ্রতা অনুভব করেছিলেন তাঁর দাঁড়িতে'।[৬]

চুল দাড়ি সাদা হওয়ার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً 'তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা এটা মুসলিমদের জন্য নূর। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি পশম সাদা হবে, এটার ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি দরজা বুলন্দ করবেন'।[৭]

প্রথম গোফ ছোটকারী : সাঈদ ইবন মুসাইব (রহঃ) বলেছেন, كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ 'ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম মেহমানদারী করেছেন, সর্বপ্রথম খাৎনা করেছেন এবং সর্বপ্রথম গোঁফ কেটেছেন'।[৮]

প্রথম ইবরাহীমী দ্বীন পরিত্যাগকারী : প্রথম ইবরাহীমী একনিষ্ঠ দ্বীন পরিত্যাগকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সে হ'ল- আমর বিন লুহাই বিন ক্বমআ বিন জিনদিফ বিন মুজা'আ।[৯]

প্রথম (أَمَّا بَعْدُ) আম্মা বা'দ এর প্রচলনকারী : স্পষ্ট ভাষা দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। বক্তব্যের ক্ষেত্রে 'আম্মা বা'দ' এর প্রচলন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَوَّلُ مَنْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ دَاوُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ 'আম্মা বা'দ বলা প্রথম ব্যক্তি হলেন দাঊদ (আঃ)। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী বাগ্মী'।[১০]

প্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সুলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন, (১) এমন ফয়ছালা, যা তাঁর ফয়ছালার মত হয়। তা তাঁকে প্রদান করা হ'ল। (২) এমন রাজ্য, যার অধিকারী তারপর আর কেউ হবে না। তাও তাঁকে দেয়া হ'ল। আর যখন তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে ছালাতের জন্য আগমন করবে, তাকে যেন পাপ থেকে ঐদিনের মত মুক্ত করে দেন, যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল'।[১১]

প্রথম বিসমিল্লাহ লেখা : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রথম ব্যক্তি হিসাবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখেছিলেন হযরত সুলাইমান (আঃ)।[১২] ইবনু জুরায়েয বলেন, সুলাইমান বিন দাঊদ (আঃ) তিনি চিঠিপত্রে বৃদ্ধি করেছিলেন যা মহান আল্লাহ বলেছেন, إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 'এটা সুলায়মানের পক্ষ হ'তে। আর তা হ'ল, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)' *(নামল ২৭/৩০)*।[১৩]

বনু ইস্রাইলীদের প্রথম ফিৎনা : বনু ইস্রাইল জাতি মহান প্রভুর পক্ষ থেকে নানাবিধ ফিৎনার সম্মুখীন হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম ফিৎনা হ'ল- নারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ 'দুনিয়া টাটকা মিষ্ট ফলের মত লোভনীয়। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কি কর? তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিৎনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে'।[১৪]

প্রথম মুছাফাহা প্রচলন : প্রথম মুছাফাহা করার প্রচলন শুরু করেছিল ইয়ামনবাসী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ইয়ামনবাসীর নিকট থেকে এসেছ। তারা নরম হৃদয়ের অধিকারী। তারাই প্রথম মুছাফাহা প্রচলন চালু করেছে।[১৫] ইয়ামনবাসীর মর্যাদা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ 'এমন কতিপয় লোক জান্নাতে যাবে, যাদের হৃদয় পাখীর হৃদয়ের ন্যায়'।[১৬] (ক্রমশঃ)

[লেখক : সহকারী সম্পাদক, তাওহীদের ডাক]

---

৫. আল-মুহাযারা ৩২ পৃঃ; কাশফুল খাফা ১/১৩২ পৃঃ।
৬. আল-মুহাযারা ৩২ পৃঃ; কাশফুল খাফা ১/১৩২ পৃঃ।
৭. আবুদাঊদ হা/৪২০২; মিশকাত হা/৪৪৫৮।
৮. মুয়াত্তা হা/১৬৭৭; বায়হাক্বী হা/৬৩৯২; মিশকাত হা/৪৪৮৮।
৯. কানযুল উম্মাহ ১২/৮২ পৃঃ; তাইসীরুল উসূল ১/১২২; ফৎহুল বারী ৮/২৮৫; আল ফৎহুল কাবীর ১/২৭৯ পৃঃ।
১০. কাশফুল খাফা ১/২২৩ পৃঃ; কানযুল উম্মাহ হা/২৯২৯২; ফৎহুল বারী ৬/৪৫৬; ইবনু জারীর ৩/৫৩৩, তিনি ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।
১১. নাসাঈ হা/৬৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ইবনু খুজায়মা হা/১৩৩৪; ইবনু হিব্বান হা/১৬৩৩।
১২. সীয়ারু আলামিন নুবালা ১/২৬০ পৃঃ; ছুবহুল আশা ১/৪২২ পৃঃ।
১৩. ফাজায়িলুল কুরআন লি ইবনু উবাইদ ৪৫২ পৃ; কুরতুবী ১/৯২ পৃঃ।
১৪. মুসলিম হা/২৭৪২; ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৩০৮৬।
১৫. আদাবুল মুফরাদ, (ইমাম বুখারী) হা/৯৬৭; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
১৬. মুসলিম হা/২৮৪৯; মিরকাত ৯/৩৫৮৪ পৃঃ. মিশকাতের ৫৬২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র.।

মাওলানা দুরুল হুদা

*[আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর রাজশাহী সদর সাধারণ সম্পাদক **মাওলানা দুরুল হুদা** (৫১)। রাজশাহী যেলার মোহনপুর উপযেলার ধূরইল ডি. এস. কামিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি দীর্ঘ প্রায় তিন দশক যাবৎ তিনি অত্র অঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। রাজশাহী মোহনপুর ও তানোর উপযেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে তাঁর বিস্তৃত পদচারণা। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হকের দাওয়াত পৌঁছে দিতে তিনি ইখলাছের সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁর কর্মমুখর সাংগঠনিক জীবন সম্পর্কে জানার জন্য সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক **ড. মুখতারুল ইসলাম**]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্মসন ও জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা দুরুল হুদা : আমার জন্ম বর্তমান নওগাঁ যেলার নিয়ামতপুর উপযেলার হাজীনগর ইউনিয়নের মাকলাহাট গ্রামে। যুদ্ধের আগের বছর ১৯৭০ সালে আমার জন্ম।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে আমরা জানতে চাই।

মাওলানা দুরুল হুদা : আমি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছি। এরপর ভর্তি হই নওগাঁ ঐতিহ্যবাহী আলাদীপুর দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদরাসায়। মাওলানা আব্দুল মান্নান আনছারী (আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন!) মাদ্রাসার কালেকশনের জন্য মাকলাহাটে আসেন। উনার সাথে আমার আব্বার পূর্ব-পরিচয়ের সুবাদে আলাদীপুর মাদরাসায় ভর্তি হই। আলাদীপুরে কিছুদিন পড়ার পর আবার গ্রামেই ভর্তি হই। যতদূর মনে পড়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার বছর আমি মাকলাহাটে হেদায়াতুন্নাহু পড়ছিলাম। কাকনহাটের পাশে রাজারামপুরের একটি মাদ্রাসাতেও কিছুদিন পড়ি। ১৯৮৭ সালে আমি দাখিল পরীক্ষা দেই মাকলাহাট থেকে। অতঃপর আলাদীপুর মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৮ সালের মে মাসে আমি দাওরায়ে হাদীছ শেষ করি। কওমী ধারা শেষ করার পর ১৯৮৯ আমি সালে রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদরাসা থেকে আলিম ও ফাযিল পাশ করি। তারপর ১৯৯৩ সালে হাদীছ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করি। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে রাজশাহী কলেজে আরবীতে ডিগ্রী (পাস) এবং ১৯৯৭ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা দেই এবং উভয় পরীক্ষাতেই ফার্স্ট ক্লাস পাই।

তাওহীদের ডাক : আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা দুরুল হুদা : আমার আব্বার নাম মুহাম্মাদ শাকির আলী। মাতার নাম যয়নব বেগম। আমরা পাঁচ ভাই ও দুই বোন। আমিই সবার বড়। আমার মেজ ভাইটা অল্প বয়সেই মারা গেছে। তৃতীয় ভাই আব্দুল হালীম। সে কওমী মাদ্রাসায় পড়ত। পরবর্তীতে জেনারেল থেকে বিএসসি ও মাস্টার্স করে বর্তমানে মোহনপুর উপযেলার মহিষকুণ্ডী হাই স্কুলের শিক্ষক। পঞ্চম ভাইও ডিগ্রী পাশ করে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করছে। ছোট বোন কামিল পাশ করে রাজশাহীস্থ শিতলাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছে।

তাওহীদের ডাক : আপনি আলাদীপুরে দাওরায়ে হাদীছ পড়ার সময় পীর ছাহেব হুযূর ও আব্দুল মান্নান আনছারী ছাহেবকে কেমন দেখেছিলেন?

মাওলানা দুরুল হুদা : আল্লাহ তাদের জান্নাতবাসী করুন! হ্যাঁ, তারা সেসময় সুস্থ ছিলেন। আমি তাদের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। পীর সাহেব হুযূরের বয়স ছিল তখন আনুমানিক ৭০-এর কাছাকাছি। আর আব্দুল মান্নান আনছারী হুযূরের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি হবে। তারা উভয়েই খুবই ভাল শিক্ষক ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি রাজশাহীতে কত সালে আসেন?

মাওলানা দুরুল হুদা : ১৯৮৮ সালে আমি রাজশাহীতে আসি। তবে আগেও এসেছি রাজশাহীতে বেড়ানোর জন্য। রাজশাহীতে আসার পর আমি ১৯৮৮ সাল থেকেই হড়গ্রাম আমবাগান আহলেহাদীছ মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব নেই। ওখানে ইমামতি করার পাশাপাশি রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্রাসায় পড়তাম। আমি সেখানে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইমামতি করি।

তাওহীদের ডাক : আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা দুরুল হুদা : ১৯৯৩ সালে কামিল শেষ করার পরে রেজাল্ট হওয়ার আগেই আমার এক ওস্তাদ মাওলানা আব্দুন নূর ইছলাহী আমাকে ডেকে পাঠালেন। উনি রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী জামিরা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার রেজাল্টের দেরি আছে। যতদিন রেজাল্ট না হয় তুমি এখানে পড়াও। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি জামিরাতে শিক্ষকতা শুরু করি আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। তারপর ডিসেম্বরের শেষ দিকে রেজাল্ট হওয়ার পর সার্টিফিকেট আসতে মার্চ মাস চলে আসল। তারপর বিভিন্ন আলিয়া মাদ্রাসাতে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করতে লাগলাম। ১৯৯৪ সালের ১৪ই জুলাই রাজশাহীর ধূরইল ডি. এস.

কামিল মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক হিসাবে যোগদান করি। তারপর '৯৫-তেই মাদ্রাসা ফাযিল পাঠদানের অনুমতি পায় এবং আমি উক্ত সালের ১লা জুলাই ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে সেখানেই যোগদান করি। আলহামদুলিল্লাহ আজ অবধি সেখানেই কর্মরত আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবনের শুরুটা কিভাবে হয়?

মাওলানা দুরুল হুদা : সেটা বলতে গেলে আমার জীবন পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা। আমি রাজশাহী শহরের হড়গ্রামে ইমামের দায়িত্বে থাকাকালীন একটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। সেসময় একদিন আমাদের মসজিদ কমিটির লোকজন আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে নিয়ে গেলেন। কিভাবে নিয়ে গেলেন, কেন নিয়ে গেলেন, সেটা আমি বলতে পারব না। আমীরে জামা'আত গেলেন। তখন তাঁর সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা ছিল না। তবে আমি যেহেতু আহলেহাদীছ, তাই আক্বীদা ও মানহাজের দিক থেকে উনার প্রতি আমার একটা সম্মানবোধ ছিল। তবে সে সময় স্যারের যাওয়াটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। তখন তিনি হড়গ্রামের আমবাগান এলাকায় সপরিবারে নতুন ভাড়া বাসায় উঠেছিলেন। উনি সেখানে যেয়ে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক চালু করেন। জুমআ'র খুৎবাও মাঝে মাঝে দিয়েছেন, তবে খুব কম। তা'লীমী বৈঠকটা খুব আকর্ষণীয় ছিল। তা'লীমী বৈঠক চালু করার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। আহলেহাদীছদের পাশাপাশি হানাফীরাও শুনতে আসত। তাঁর বক্তব্য শুনে ঐ পাড়ার সব হানাফীরা শবেবরাতের হালুয়া-রুটি খাওয়া বন্ধ করে দিল এবং সর্বতোভাবে তা বর্জন করল। এগুলি দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমার মনের ভিতরে একটা দুর্বলতা তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। যারা সসম্মানে আমীরে জামা'আতকে মসজিদে নিয়ে আসলেন তারাই আকস্মিকভাবে একদিন জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর সভাপতি ড. আব্দুল বারীকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং তিনি জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত সম্পর্কে খুব আপত্তিকর ভাষায় নানা কথা বললেন। তখন থেকে উক্ত মসজিদে আমীরে জামা'আতের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

তাওহীদের ডাক : তখন কি জমঈয়ত বা যুবসংঘ-এর ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা ছিল?

মাওলানা দুরুল হুদা : জমঈয়ত সম্পর্কে আমার আগে থেকেই ধারণা ছিল। কিন্তু ভিতরে এত সমস্যা ছিল সেটা আমার জানা ছিল না। জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী ছাহেবকে আমি খুব সম্মান করতাম। আমি যখন দাওরায়ে হাদীছ পড়ি আলাদীপুর মাদরাসায়, তখন ড. আব্দুল বারী ছাহেব একবার সেখানে গিয়েছিলেন। উনাকে তখন দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি নিজ হাতে উনার খেদমত করেছি। কিন্তু যেদিন ড. আব্দুল বারী ছাহেব হড়গ্রামে আসলেন এবং সবাইকে নিয়ে মিটিং করলেন, তখন উনার বক্তব্য আমার ভালো লাগেনি। পুরোটাই আমীরে জামা'আতের বিপক্ষে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং ভাষাগুলো ছিল আক্রমণাত্মক। এমন ভাষা বা আচরণ প্রয়োগ করছিলেন, যা তাঁর জন্য মোটেও শোভনীয় ছিল না। ফলে উনার প্রতি আমার ভক্তি কমে গেল। আমীরে জামা'আতের প্রতি ভক্তি আরো বেড়ে গেল। এটা ১৯৯১ সালের ঘটনা। ঐ দিন প্রোগ্রাম শেষ করে ড. আব্দুল বারী ছাহেব চলে গেলেন। তারপর থেকে যারা আমীরে জামা'আতকে ঐ মসজিদে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তারাই তাঁর উপর রীতিমত অত্যাচার করা শুরু করল। এমনকি আমীরে জামা'আত বাজার করতে গেলেও সেখানে তারা ঝামেলা করত।

তাওহীদের ডাক : ইমাম হিসাবে সেখানে আপনার ভূমিকা কি ছিল?

মাওলানা দুরুল হুদা : উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি যে হকের উপরে আছেন, তাও অনুধাবন করতে পারলাম। ফলে তাঁর প্রতি ভক্তি যেমন বাড়ল, তেমনি সংগঠনের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হ'ল। আমীরে জামা'আত তখন আমার মসজিদ থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে হড়গ্রাম আমবাগানের অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান ছাহেবের ভাইয়ের বাসায় ভাড়া থাকতেন। ফলে আমি মাঝে মধ্যে গিয়ে স্যারের বাসার বাজার করে দিতাম। এভাবে স্যারের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছিল। এর আগেও আমি অনেক আলেম-ওলামার সান্নিধ্যে ছিলাম। উনাদের পারিবারিক পরিবেশ দেখেছি এবং স্যারেরটাও দেখলাম। আমীরে জামা'আতের পারিবারিক পরিবেশ দেখার পর উনার পরিবারের প্রতি আমার একটা সম্মানবোধ তৈরী হয়েছিল। আমীরে জামা'আতের বড় ছেলে ছাকিব ও নাজীব তখন খুব ছোট ছিল। তামান্না তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। শাকিরের তখনও জন্ম হয়নি। আমীরে জামা'আতের বাসার কাজে সহযোগিতার কারণে মসজিদ কমিটি আমার উপরও চড়াও হ'ল। তারা আমীরে জামা'আতের বাসা থেকে মসজিদে আসার সোজা রাস্তাটা বন্ধ করে দিলেন যাতে তিনি মসজিদে আসতে না পারেন। কেননা অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসতে অনেক সময় লাগত। এসব দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ইমামতি ছেড়ে দিলাম এবং মেসে থাকতে শুরু করলাম। মেসে যখন থাকতাম তখন আমি রাণীবাজারে যুবসংঘ অফিসে আসতাম। তখন যুবসংঘ অফিস নিয়ে জমঈয়তের সাথে খুব দ্বন্দ্ব চলছিল। অন্যদিকে নওদাপাড়ায় বিল্ডিংয়ের কাজ ও শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়। ১৯৯১ সালে জমিজমা কেনা হয় এবং বিল্ডিংয়ের কাজ অনেকটাই হয়ে যায়। ১৯৯১ সালেই ১ম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা হয়। আমি তখনও সেই ইসলামী ছাত্র

সংগঠন করলেও ইজতেমার জন্য কালি দিয়ে ওয়াল রাইটিং করেছিলাম। আমার রাতের বেলায় ওয়াল রাইটিং করার অভ্যাস ছিল। আহলেহাদীছের কয়েকটা ছেলে আমার সাথে উক্ত সংগঠন করত। তাদেরকে সাথে নিয়ে এশার ছালাত আদায় করে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই বের হয়ে গেছি। সারারাত ওয়াল রাইটিং শেষে ফজরের আযানের আগে এসে ছালাতে ইমামতি করেছি। মেডিকেল, লক্ষ্মীপুর, ফায়ার সার্ভিস মোড়, সাহেব বাজার থেকে পশ্চিম দিকে জিরো পয়েন্টে 'যুবসংঘে'র মনোগ্রামের যে ছাপ মারা ছিল সবগুলো আমার করা।

তাওহীদের ডাক : আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন। রাজশাহী যেলার মোহনপুর ও তানোর উপযেলায় আপনি দাওয়াতী খেদমতে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার কিছু অভিজ্ঞতা কি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন?

মাওলানা দুরুল হুদা : যুবসমাজের বিষয়ে একটা কথা আমাকে বলতেই হবে যে, যৌবনকালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাতে যদি তারা ইসলামের পথে থাকে, হক পথে থাকে, তাহ'লে এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটা বিশেষ সাহায্য আসে। এটা তার ইহকাল ও পরকালেও কামিয়াবী বয়ে আনবে। আমার যৌবনকালের কিছু অভিজ্ঞতা উল্লেখ করব।

(১) আমি ধূরইল ডি.এস. কামিল মাদ্রাসায় যোগদান করলাম ১৯৯৪ সালে। তখন আমি তেইশ/চব্বিশ বছরের টগবগে যুবক। সেসময় মাঠে-ময়দানে কাজ করা খুবই কঠিন ছিল। মোহনপুর এলাকায় কাজ করতে গিয়ে আমি প্রথম বাধাগ্রস্ত হই মারেফতী পীর-ফকীরদের দ্বারা। সেসময় সমাজে তাদের ভীষণ দাপট ছিল। তারা এলাকাতে ছালাত আদায় করা লাগবে না, কীসের ছালাত? ইত্যাদি ভ্রান্ত কথাবার্তা প্রচার করত।

১৯৯৬ সালে একদিন ধূরইল বাজারে গেলাম। সেখানে হানাফী মসজিদে মাগরিবের ছালাত পড়লাম। ছালাতের আগেই কয়েকটা লোক এসে জানাল এলাকায় ফকীরেরা বলছে যে, ছালাত পড়া লাগবে না। ছালাত না পড়ার অনেক দলীল আছে। সেদিন হাটের দিন ছিল। শনিবার অথবা বুধবারের দিন হবে। মাগরিবের ছালাত শেষে দেখি আমার জন্য অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে যাওয়ার পরে দেখি লোকে লোকারণ্য। তার নাম হ'ল আকবর ফকীর, মোহনপুরেই বাড়ি। আমি বললাম, কথা কী আপনি শুরু করবেন, না আমি শুরু করব? উনি আমাকে অহংকারের স্বরে বললেন, আপনার ইচ্ছা! আমি বললাম আপনি কিছুক্ষণ আগেও বলেছেন যে, শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত এবং মারেফতের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য দিতে পারবেন। এবার আপনি বলুন, শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফতের অর্থ কী? এবার সে কথা বন্ধ করে দিল।

আমি আবার বললাম, আপনাকে বলতে হবে শরীয়ত শব্দটা বাংলা, ইংরেজী, আরবী না ফার্সী? এভাবে আরো অনেক প্রশ্ন করলাম। কিন্তু সে কোন জবাব দিতেই পারল না। আমি তখন জনগণকে লক্ষ্য করে বললাম, ইংরেজীতে ওয়াটার, আরবীতে মা-উন এবং বাংলায় জল বা পানি মানে পানি। অনুরূপভাবে শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত এবং মারেফত সবই ইসলাম। কোনটিই কোনটি থেকে আলাদা কিছু নয়। পীর-ফকীররা এসব নিয়ে মানুষদের বিভ্রান্ত করছে। তখন কি আর জনগণকে থামানো যায়? জনগণ তখন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যাই হোক কিছু লোক ছিল তারা উক্ত ফকীরকে এক বাড়িতে তুলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল। আর এভাবেই সেদিন হকের বিজয় হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আকবর ফকীর কয়েকজন ছেলে নিয়ে আমাকে মোহনপুর থানায় আক্রমণ করে। তারা আমাকে ঘিরে ফেললে আমি বললাম, দেখেন ঘটনা তো ধূরইলের। আপনারা মোহনপুরের। আমি নেয়ামতপুর, নওগাঁর লোক। আপনাদের কি মনে হয় আমি বাইরের লোক হয়ে, ধূরইলের জামাই হয়ে মোহনপুরের লোকের ওপর টর্চার করতে পারি? মূল ঘটনাটা জানার পর ছেলেগুলোও ফকীরের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। একটা ছেলে তাকে গাল-মন্দ করে বলল, গাজা খেয়ে তুমি হুযূরের সাথে লাগতে এসেছ? তারপর আকবর ফকীরসহ সবাই চলে গেল।

(২) এর কয়েকদিন পর হঠাৎ আমার মাদ্রাসার কিছু ছাত্র একটু উজ্জীবিত হয়ে এলাকার সদের ফকীরের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিতর্কের আগে তারা ঠিক করে, যে হেরে যাবে তার মাথা ন্যাড়া করা হবে। বিতর্কে আমার মাদ্রাসার ছেলেদের প্রশ্নবানের উত্তর দিতে না পারলে তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। এ ঘটনা আমি পরে জেনেছি। এর দিন কয়েক পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মজীদ মোল্লা আমাকে ডেকে বললেন যে, ওসি ছাহেব আমাকে চুল কাটার ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন।

আমার কাছ থেকে বিষয়টা শোনার পর উনি আমাকে একটা তারিখ দিলেন যে, অমুক তারিখে আপনি ইউনিয়ন কাউন্সিলে আসবেন। যাওয়ার পরে চেয়ারম্যান ছাহেব উনার পাশের চেয়ারে আমাকে বসালেন। বিচারে শুরুতেই চেয়ারম্যান ছাহেব সদের ফকীরকে জিজ্ঞাস করলেন, তোমার চুল কেটেছে কে? তখন সে বলল, দুরুল কেটেছে দুরুল। চেয়ারম্যান ছাহেব বললেন, তুমি কি তাকে চেন? সদের ফকীর বলছে চিনব না মানে? আমাদের এক ছাত্র আব্দুল বারীকে দেখিয়ে যেই বলেছে এইটা দুরুল, তেমনি বিচার ওখানেই শেষ হয়ে গেল। চেয়ারম্যান ছাহেব ফাইনাল রিপোর্ট দিলেন, এটা হয়রানীমূলক অভিযোগ ছিল। *ফালিল্লাহিল হামদ*। এভাবে ধূরইল এলাকায় ফকীরদের দৌরাত্ম্য কমে গেল।

(৩) ১৯৯৬/৯৭ সালের বিদ'আতী হুযূররা আমার ওপর টর্চার শুরু করল। তারা ফরজ ছালাতের পর মুনাজাত, ঈদের ছালাত শেষে মুনাজাত, জানাযা শেষে মুনাজাত, কবরকেন্দ্রিক নানা বিদ'আতে জড়িত ছিল। এটা আমার জীবনে খুব বড় ধাক্কা ছিল। তখন আমি ধূরইল হাজীপাড়া মসজিদে ছালাত আদায় করি ও সেখানেই থাকি। ১৯৯৬ সালের কথা। একদিন হাজীপাড়া মসজিদের দায়িত্বশীলরা আমাকে বলছেন, আপনি ফেৎনা করেন কেন? এই কথাটা আমার আজও মনে আছে যে, আপনি দো'আ করেন না কেন? আমি বললাম, আমি দো'আ করিনা কিন্তু আমি কি আপনাদের মসজিদে ইমামতি করি? আমি কি কাউকে বলেছি যে, তোমরা মুনাজাত করবে না? আপনার মুছল্লীদের জিজ্ঞাসা করেন তো? আপনাকে কি এ বিষয়ে কিছু বলেছি? আপনাকে আমি বলিনি, আপনার মুছল্লীদের কাউকেও কিছু বলিনি। আমি ইমামতিও করিনা। তাহলে কি ফেৎনা আমি করলাম? না আপনারা আমাকে জোর করে মুনাজাত করিয়ে নিবেন? আর নিজেরাই ফেৎনা সৃষ্টি করবেন? তারপর তারা চুপ হয়ে গেল। আর কিছু বলল না।

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাগরিবের পর ত্রিমোহনী থেকে ভ্যানগাড়িতে উঠেছি বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ভ্যানে বসা অন্য যুবকরা আমার বিষয়ে অনেক আলোচনা করছে। তখন আমি বললাম, কি হয়েছে বাবা? তারা বলল, নওদাপাড়া থেকে দুরুল নামে এক হুযূর এসে আমাদের এলাকায় ধর্ম-কর্ম সব বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আজ ধূরইল বাজারে বাহাছ আছে। আমি বললাম, শুনেছি যে ফেব্রুয়ারীর ২২/২৩ তারিখে হবে? তারা জানাল, না না, আজকেই হবে। আপনি ওখানে যাবেন না? তারপর আমি নেমে গেলাম। বাসায় ঢুকতেই আমাদের কিছু ছেলের মুখ শুকনো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? তারা বলল, আজকে বাহাছ হবে। আপনি যাবেন না। আমি বললাম, আমাকে তো তারা দাওয়াত দেয়নি; আর আমি এমনিতেই যাব না। আমি বললাম, তোমরা কেউ কি তাদের বক্তব্যটা টেপ রেকর্ড করে আনতে পারবে? একজন বলল, আমি পারব। ফজরের আগে আমি ক্যাসেট হাতে পেলাম। ছালাত শেষ করার পর ক্যাসেট কিছুটা শুনলাম। তাদের সমস্ত বক্তব্য ছিল হিংসাত্মক ও উগ্রতায় ভরা। আমি তাদেরকে জ্ঞিসাসা করলাম, উনারা আছেন কোথায়? ওরা জানাল যে, রেফ্যুজী পাড়াতে তারা আছে।

আমি হাজীপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদের মুওয়ায্যিন আব্দুস সাত্তারকে বললাম সাইকেল নাও। আমার কাছে যেসব মূল কিতাব ছিল, সেগুলো সাইকেলে বাঁধলাম। ফেব্রুয়ারী মাস। ঝলমলে রোদ উঠেছে। হালকা ঠাণ্ডাও আছে। এভাবে আমাদের দেখে ১৫-২০ সঙ্গীও হয়ে গেছে। মেহমানরা যে বাড়িতে আছেন সে বাড়ির গেটের কাছেই বাড়িওয়ালা বলছে কোথায় যাবেন? আমি বললাম, রাতে যারা তাফসীর করেছে তাদের সাথে দেখা করতে যাব। তারা দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, এখন যাওয়া হবে না। উনারা কথা বলতে পারবেন না। আমি বললাম, উনাদেরকে বলেন যে, তারা গত রাতে যে বক্তব্য দিয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু কথা বলব, আর আমার সাথে কেউ থাকবে না। এর মধ্যে উৎসুক অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। কারণ তারা রাতে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল যে, আমরা সকাল পর্যন্ত আছি, কারো যদি সাহস থাকে, সে যেন আসে। তখন আমার সাহস বহু গুনে বেড়ে গেছে। আমি বললাম, উনারা যাই বলুক, উনাদের সাথে কথা বলতেই হবে। উনারা যেভাবে কথা বলতে চায়, সেভাবেই বলব। আর সেক্ষেত্রে একটা টেপ রেকর্ডার থাকবে আর কথাগুলো রেকর্ড হবে। কিন্তু তারা কোনভাবেই বসতে রাযী না হওয়ায় এক অভাবিত বিজয় হয়ে গেল।

(৪) সেসময় ইফতারের সময় ৬/৭ মিনিট কমবেশী হত। হাজীপাড়াতে আমি একদিন ইফতার করছি, ঠিক সেইসময় মসজিদের ইমাম নযরুল ছাহেব আযান দিতে উঠল। তিনি মাইকে আযান শুরু করবে এমন সময় যহীর *(বছর দুয়েক আগে সে মারা গেছে। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন)* নামে একজন ব্যক্তি মাইক কেড়ে নিল। মাইক কেড়ে নেওয়ার পর বলল, আমাদেরও হুযূর আছে। বেলা থাকতে সব ইফতার করবে, সব ইহুদী-খ্রিষ্টানের দালাল। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এরা বেলা থাকতে ইফতার করে। একটা চরম বিপর্যয়কর অবস্থা।

বাদ মাগরিব ঐ এলাকার গণ্যমান্য লোক আলহাজ্জ আনীসুর রহমান এলেন। তাঁর অন্যান্য আক্বীদা ঠিক থাকলেও এ বিষয়ে তিনি ঐ পক্ষের। সবার সামনে আমি বললাম, দেখেন হাজী ছাহেব, এর একটা ফায়ছালা আছে, সমাধান আছে। এটা যদি আপনি করতে পারেন, সমাধান হয়ে যাবে। আমি বললাম, নযরুল আযান দেয় হাজীপাড়ায় বেলা থাকতে আর পণ্ডিতপাড়া আযান দেয় বেলা ডুবে গেলে। এটাই অভিযোগ। এটাই যদি অভিযোগ হয়, তাহলে তো এর একটা তদন্ত আছে? এত হট্টগোল আর ভালো লাগছে না। মানিকডাঙ্গা ঈদগাহ মাঠের চারিদিকে ফাঁকা। একদিন চলেন আমি আর আপনি আরও দু'একজনকে নিয়ে সেখানে ইফতার করব। মসজিদের আযান সব শোনা যাবে এখানে। ইফতার যখন করব আকাশ ফাঁকা থাকবে। যেদিন বলবেন, সেদিনই যাব। ইফতারী আমি দিব। যদি দেখা যায় যে, বেলা ডোবার আগেই নযরুলও আযান দিচ্ছে, তাহ'লে অবশ্যই নযরুল সবার ছিয়াম নষ্ট করছে। তাহ'লে কি আপনি বলতে পারবেন যে, আমি স্বচক্ষে দেখে আসলাম নযরুল বেলা থাকতে তুমি আযান দিচ্ছ? আর ওকে দু'থাপ্পড় দিয়ে ইমামতি থেকে বাদ দিতে পারবেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারব।

আমি বললাম, ঠিক আছে এটার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে হাজীপাড়াতেই। অবশেষে দু'পক্ষের হুযূর নিয়ে একটা তারিখ ঠিক করে আমরা খোলা মাঠে ইফতার করতে বসলাম। পরে

যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে বিষয়টি সকলেই বুঝতে পারে এবং সত্যের বিজয় হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আমীরে জামা'আত বলেন, 'সাহস না করলে কিছু হয় না'। যুবকদের ঝুঁকি নেওয়ার বয়স। যুবকরা সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেই আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হওয়ার পর একটা ঝড় এসেছিল আহলেহাদীছদের উপর। সেদিনগুলো আপনার কিভাবে কেটেছিল?

মাওলানা দুর্রুল হুদা : ২০০৫ সালের সেই কঠিন দিনগুলিতে তখন আমি মোহনপুর উপযেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলাম। কর্মীদের মধ্যে একটা ভীতিকর অবস্থা ছিল। সে সময় কিছু সুযোগসন্ধানী লোক আমাদের ব্যাপারে প্রশাসনের কান ভারী করত। ফলে প্রশাসনের লোকেরা আমাদেরকে সন্দেহ করত। আমি সব কর্মীদের ডেকে বললাম, আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হয়েছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়েছেন, তাই বলে কি আপনার ধর্ম বদলে ফেলবেন? তখন আমি ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা বলে কর্মীদের উজ্জীবিত করলাম। কারো না কারোর উপর বিপদ আসতেই পারে। আর যদি মোহনপুরের কারো উপর মামলা হয়ে যায়, তার পরিবারের দেখাশোনা ও মামলা খরচের ব্যবস্থা আমরা সবাই মিলে করব ইনশাআল্লাহ। তারপর কর্মীরা পূর্বের মত সৎসাহস নিয়ে আবার মাঠে-ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উপযেলা পর্যায়ে আমরা আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবিতে একটা বড় ধরনের সম্মেলনের প্রস্তুতি নিলাম। হঠাৎ সম্মেলনের দিন তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী রাজশাহীতে এসেছেন। সেদিন আবার জুম'আর দিনও ছিল। ওসি ফোন দিয়ে বললেন, উপরের নির্দেশ রয়েছে আপনাদের প্রোগ্রাম বাতিল করতে হবে। আমি বললাম, আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। জুম'আর পরপরই আমাদের কর্মীরা চলে আসবে। এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওসি ছাহেব কথা শুনে বুঝতে পারলেন, এরা অনুষ্ঠান করবে। এরপর উনি একটি সংকেত বা পরোক্ষ হুমকিও দিয়ে বসলেন যে, আমি শুনেছি ধূরইল মাদ্রাসার একজন ভাইস প্রিন্সিপাল আছে। উনি নাকি এর উদ্যোক্তা। যদি কোন অঘটন ঘটে, তাহলে সব দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়বে। আমি বললাম, যেসব লোকজন আসবে, ইনশাআল্লাহ তাদের দ্বারা কোন প্রকার অঘটন ঘটবে না। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন যে, আমার কোন কর্মী কোন প্রকার বিশৃংখলা ঘটাবে না ইনশাআল্লাহ। এরপর তিনি এতটুকু বললেন, পুরোটা আপনাদের রিস্ক।

সম্মেলন শুরু হ'ল। মোহনপুর সরকারী কলেজ মাঠ একেবারে লোকে লোকারণ্য। আছরের পূর্বেই মাঠ পরিপূর্ণ। প্রধান অতিথি হিসাবে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর ড. মুছলেহুদ্দীন ছাহেব উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ কোন বাধা ছাড়াই মাগরিবের আগে সম্মেলন শেষ করে দিলাম।

পরিশেষে যে সমস্ত পুলিশ ছিল তারা বলল যে, 'আমরা যেটা মনে করেছিলাম সেরকম না। আপনাদের কর্মীরা খুবই ভদ্র। তারপর জাতীয় পত্রিকায় রিপোর্ট হ'ল। মানুষের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'ল। অতঃপর রাজশাহী সাহেব বাজারে আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হ'লে আমাদের এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ পাগলপারা হয়ে ছুটে গিয়েছিল। তারপর ঢাকার মুক্তাঙ্গনের সমাবেশে আমার প্রচণ্ড জ্বর থাকায় ইচ্ছা থাকার পরেও যেতে পারিনি। সেখানেও আমাদের কর্মীরা গিয়েছিল এবং প্রতিটি প্রোগ্রামে আমাদের লোকজন অংশগ্রহণ করেছিল।

২০০৭ সালের একটা স্মৃতি না বললেই নয়। একদিন আমি ট্রেনে ঢাকা যাচ্ছি বোর্ডের কাজে। সাথে আমার মাদ্রাসার চার জন শিক্ষক আছেন। পথিমধ্যে আমীরে জামা'আতের বড় ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সাথে দেখা হ'ল। সেও আমাদের সাথে রাজশাহী স্টেশন থেকে বিকালের ট্রেনে উঠেছে। ট্রেন যমুনা ব্রীজ পার না হ'তেই দেখি একজন লোক তাকে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। ছাকিব আমার দিকে ইশারা করে বলল, ইনি আমার পরিচিত। লোকটি কিছু বুঝতে না বুঝতেই আমাকে আমার সঙ্গীসাথীসহ ছাকিবকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল। পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম, তারা মূলত র‍্যাবের লোক। পরে তারা তাদের গাড়িতে করে আমাদেরকে সিরাজগঞ্জ শহরে র‍্যাবের দফতরে নিয়ে গেল। সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আবার ছেড়ে দিল।

সেদিন জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে একটা মজার ঘটনা ঘটল। আমরা সবাই নিজ নিজ পরিচয় আহলেহাদীছ হিসাবে দিলাম। কিন্তু আমাদের একজন শিক্ষক তার পরিচয় দিতে গিয়ে ভয়ে নিজেকে আহলেহাদীছ না বলে মালেকী বলল। এ কথা শুনে র‍্যাব অফিসার বিস্ময় নিয়ে বললেন, বাংলাদেশে মালেকী মাযহাবের কেউ আছে নাকি? উক্ত শিক্ষক কিছু বলতে না পেরে নিরুত্তর রইলেন। আরেকটি বিষয় ছিল, গ্রেফতার হ'তে পারি এমন স্পষ্ট আশংকা নিয়েও আমরা তাদের প্রশ্নের মুখে কোন অবস্থাতেই সাহস হারাইনি। কেননা আমরা জানতাম, আমরা অপরাধী নই। সুতরাং নৈতিক দৃঢ়তার সাথে আমাদের মানহাজ, আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দ্বিধায় তাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। আমীরে জামা'আতকে যে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে সে কথাও বললাম। এমনকি প্রচলিত গণতন্ত্র কেন সমর্থনযোগ্য নয়- এমন স্পর্শকাতর বিষয়েও ছাকিব উদাহরণসহ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিল। আমাদের স্পষ্টবাদিতায় তারা বরং খুশীই হলেন এবং সম্মানের সাথে চা-নাশতা করালেন। পরবর্তীতে তাদের গাড়ীযোগে শহর থেকে কড্ডার মোড়ে এনে নামিয়ে দিলেন। আমরা সেখান থেকে রাত প্রায় ১১টার দিকে বাস যোগে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

তাওহীদের ডাক : অনেকে বলেন, আহলেহাদীছরা দলে নয় বরং দলীলে বিশ্বাস করে। অনেক আলেম বলে, সংগঠন

করার কোন প্রয়োজন নেই এবং সাংগঠনিক ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়াটাকে ধর্মীয় দায়িত্ব এবং এটিই জাতীয় ঐক্যের রূপরেখা বলে তারা মনে করেন। সংগঠনের দীর্ঘদিনের সহযাত্রী এবং তৃণমূল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মী হিসাবে আপনি কিভাবে তাদের বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করবেন?

মাওলানা দুরুল হুদা : এমন বক্তব্যের সাথেই আমি মোটেও একমত নই। এটা আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত মহলের দুঃখজনক অপপ্রয়াস এবং সংগঠনকে বাধাগ্রস্ত করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। আহলেহাদীছরা দল ও দলীল উভয়টাতেই বিশ্বাসী। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রযাত্রার পিছনে যে বড় শক্তি নিহিত, তা বিশুদ্ধ দলীল অনুযায়ী আমলের চেষ্টা এবং সুশৃংখল সাংগঠনিক জীবনের ফলাফল।

এটা মনে রাখতে হবে যে, একটা ইট দিয়ে যেমন একটা বিল্ডিং হয় না। আবার তার ফাউণ্ডেশন নীচ থেকে ভাল না হলে মযবূত বিল্ডিং তৈরী হয়না। সুতরাং আহলেহাদীছের দাওয়াত বা সালাফী দাওয়াত দিতে গেলে যেমন বিশুদ্ধ দলীলের প্রয়োজন, তেমনিই একটি সংঘবদ্ধ প্লাটফর্ম প্রয়োজন। উভয়মুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফলতা আসবে। এটাই ছিল নবী-রাসূলদের কর্মনীতি। এই জিনিসটাই আমাদের মনে রাখতে হবে। কারো ষড়যন্ত্রমূলক বিদ্বেষী প্রচারণার পাতা ফাঁদে মোটেই পা দেয়া সমীচীন না।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি। এই সমিতি কোন প্রেক্ষাপটে তৈরী করা হয়েছে?

মাওলানা দুরুল হুদা : মূলতঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত একটি স্বপ্ন নিয়ে এটি গঠন করেছেন। তাঁর ভাবনার একটি অংশ হচ্ছে যে, আমরা মানুষের আক্বীদা ও আমল সংস্কারের জন্য দাওয়াতী ময়দানে কাজ করছি। শিক্ষার সাথে যারা জড়িত, বিশেষতঃ শিক্ষকদের মাঝেও এই দাওয়াতটা যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের আন্দোলন আরেকটু ত্বরান্বিত হবে। বিশেষতঃ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক দাবী-দাওয়া পেশ করার ক্ষেত্রে প্লাটফর্মটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং এটা খুবই উপযুক্ত একটি ভাবনা। এ ভাবনার আলোকেই মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে ২০১৮ সালে 'আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি' গঠিত হয়।

তাওহীদের ডাক : জাতি গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা কি হবে বলে আপনি মনে করেন?

মাওলানা দুরুল হুদা : জাতি গঠনের জন্য একজন শিক্ষকের নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থেকে সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হ'তে হবে। ঈমানের দৃঢ় বিশ্বাসটা যেকোন পরিস্থিতিতে মাথায় রাখতে হবে। সাথে সাথে জবাবদিহিতা থাকতে হবে, পরকালীন জবাবদিহিতা। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তাহলে বাকী গুণাবলী এমনিতেই অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র মুখপত্র তাওহীদের ডাক পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন?

মাওলানা দুরুল হুদা : সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে আমাদের প্রচারটা বেশী দরকার। আর আমাদের প্রচার মাধ্যম হচ্ছে 'আত-তাহরীক' পত্রিকা, 'আত-তাহরীক টিভি' ইত্যাদি। অনুরূপভাবে 'তাওহীদের ডাক' সংগঠনের প্রচার মিডিয়ার একটি অনন্য অংশীদার। যুবকদের মাঝে এটি বেশ সাড়া জাগিয়েছে। পাঠকদের বলব আপনারা 'তাওহীদের ডাক' নিজে পড়ুন, অপর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিন এবং হকের দাওয়াত প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন।

তাওহীদের ডাক : জাযাকাল্লাহ খায়রান, অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য।

মাওলানা দুরুল হুদা : আল্লাহ আপনাদেরকেও ভালো রাখুন। আমীন!

স্মৃতিচারণ : শেখ আব্দুছ ছামাদ

স্মৃতির আরশিতে আব্দুছ ছামাদ

-ড. নূরুল ইসলাম

ছিপছিপে এক চটপটে তরুণ। দ্রুত হাঁটার গতি। দরাজকণ্ঠ। মেযাজী ও স্পষ্টবাদী। আমানতদার, সাহসী ও নির্ভীক। আমাদের হৃদয়ের ক্যানভাসে ভাস্বর এই হ'ল আব্দুছ ছামাদের প্রতিচ্ছবি।

আব্দুছ ছামাদ মারকাযের দীর্ঘকালীন ও প্রাচীন ছাত্রদের অন্যতম। ১৯৯২ সালে যশোর ও সাতক্ষীরার যে কয়জন ছাত্র দ্বীনী ইলম শিক্ষার প্রবল আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে ভর্তি হয়েছিল, সে ছিল তাদের একজন। মারকাযে সে আমার এক বছরের জুনিয়র হলেও আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। মারকায জীবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, সাংগঠনিক জীবন ও পরবর্তীতে সহকর্মী হিসাবে আমাদের হৃদ্যতা ছিল অতলস্পর্শী। এমনকি তার পরিবারের সদস্যদের সাথেও আমাদের পরিচিতি ছিল। তার চাচা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম তো মারকাযে আমাদের আদর্শস্থানীয় শিক্ষক ছিলেন।

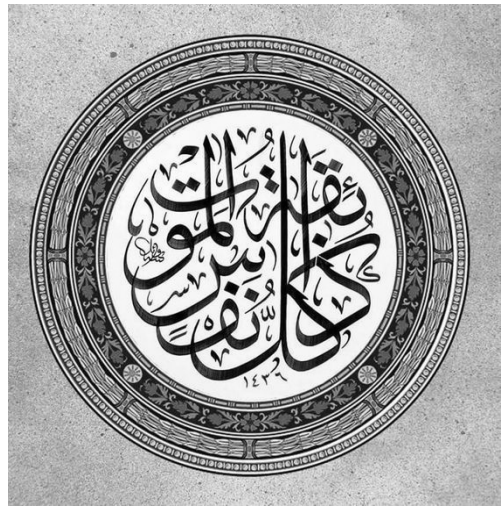

বন্ধুবর আব্দুছ ছামাদের সাথে হৃদ্যতার সুবাদে তার বাড়িতে কয়েকবার বেড়াতে গিয়েছি। বিশেষত স্মৃতির মুকুরে জ্বলজ্বল করছে ২০০৩ সালের সফরের কথা। সে বছর আমি মারকায থেকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। মদীনা যাত্রার পূর্বে হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকায় ৮/১০ জনের একদল ছাত্রের সাথে যশোর ও সাতক্ষীরা সফর করেছিলাম। সেই যাত্রায় আব্দুছ ছামাদের বাড়িতে ১/২ দিন অবস্থান করেছিলাম। এই সফরের একটা মজার ঘটনা হ'ল, আমরা সাতক্ষীরার ঐতিহ্যবাহী 'হেলিকপ্টার' (যাত্রীবাহী সাইকেল) না পেয়ে প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যেই ঝাউডাঙ্গা বাজার থেকে পায়ে হেঁটে ৭/৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কাকডাঙ্গায় আব্দুর রশীদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারুণ্যের উচ্ছল সেই দিনগুলি প্রতিনিয়ত স্মৃতির পাতায় আলোড়িত হয়। আব্দুছ ছামাদের বিয়েতে বরযাত্রী হিসাবে গমনও একটি দারুণ সুখস্মৃতি। তখন তার নতুন পাকা বাড়িটি সদ্য সম্পন্ন হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, 'শেখ ছাহেব! বেশ চমৎকার বাড়ি করেছ'। গালভরা হাসি দিয়ে সে জবাব দিয়েছিল, 'জ্বী, নূরুল ভাই'। রাজশাহী থেকে আমি ও যুবসংঘের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ তার বিয়েতে যাওয়ায় সে দারুণ খুশি হয়েছিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের ছাত্র হওয়ার সুবাদে আমরা বাসে প্রায় সময় এক সাথে যাতায়াত করতাম। কতো যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। বিশেষত আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের মুক্তির দাবিতে রাবি ক্যাম্পাসে আয়োজিত মিছিল-সমাবেশের সে ছিল প্রাণ। তার উচ্চকণ্ঠের শ্লোগান এখনও যেন কানে বাজছে।

সাংগঠনিক জীবনে আব্দুছ ছামাদ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক (২০০৭-২০০৯), অর্থ সম্পাদক (২০০৯-২০১১) ও সাংগঠনিক সম্পাদক (২০১৬-২০১৮) হিসাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনকালে জনৈক দুষ্কৃতিকারীর অপকর্মের জের ধরে ২০০৯ সালের ২০শে নভেম্বর শুক্রবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে মারকায থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার সাথে মারকাযের তৎকালীন ছাত্র (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত বোর্ডিং সুপার) মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামও গ্রেফতার হয়েছিল। আমরা তাদেরকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু থানার লোকজন তাদেরকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে কোর্টে চালান করে দিয়েছিল। পাঁচদিন হাজতবাস শেষে ২৪শে নভেম্বর ২০০৯ মঙ্গলবার বিকাল ৫টার সময় তারা জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছিল। অথচ সেই দুষ্কৃতিকারীর দুষ্কর্মের সাথে তাদের বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল না। বিনা দোষে জেল খাটায় সে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিল।

আব্দুছ ছামাদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তার আমানতদারিতা। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও মারকাযে ৫ বছর

(২০১১-২০১৫) বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব পালনকালে সে যে সততা ও আমানতদারিতার পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই বিরল। তার মৃত্যুর পরের দিন ২৮শে মে'২১ তারিখের জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত তার এ বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমাদের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আমাকে রিপোর্ট দিয়েছেন, তার পাঁচ বছরের বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব পালনকালে একদিনের একটা হিসাবেরও খেয়ানত আমরা পাই নাই। আলহামদুলিল্লাহ। টাকা-পয়সার খেয়ানত তো প্রায়ই হয়, তাই না? কিন্তু তার কোন বদনাম পাওয়া যায়নি'। আমীরে জামা'আত খুৎবায় তার মাগফিরাতের জন্য অশ্রুসজল নয়নে কাতরকণ্ঠে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছিলেন।

আব্দুছ ছামাদ মারকাযের বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব হস্তান্তর কালে ৩,২৫,৫২৬/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাযার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা নগদ উদ্বৃত্ত রেখে গিয়েছিল। বোর্ডিং পরিচালনায় তার আন্তরিকতা, দক্ষতা, সততা ও আমানতদারিতার এটি ছিল এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

আব্দুছ ছামাদ মেধাবী ছাত্র ছিল। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ পাশ করেছিল। সেই সাথে মারকায থেকে দাওরায়ে হাদীছও শেষ করেছিল। দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ (বাঁকাল, সাতক্ষীরা) মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সে ১ম স্থান অধিকার করে ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারী বাঁকাল মাদ্রাসায় যোগদান করেছিল। সেখানে সে একইসাথে হোস্টেল সুপারের দায়িত্বও পালন করত। আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানই ছিল তার আমৃত্যু কর্মস্থল। তাছাড়া সে সাতক্ষীরা যেলা 'আল-'আওন'-এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছে।

নওদাপাড়া মারকাযের পুরনো ছাত্র হিসাবে এখানকার বহু ঘটনা ও বিষয়ের সে বিশ্বস্ত স্বাক্ষী ও জীবন্ত ইতিহাস ছিল। নওদাপাড়া মাদ্রাসার সাবেক ছাত্রদের ফেসবুক গ্রুপ 'সাবেক মারকাযিয়ান' খোলা হলে সে আমাদের সাথে অনেক অজানা তথ্য শেয়ার করত। মারকায ও সংগঠনের বহু দুর্লভ তথ্য ও ছবি তার কাছে আছে বলে এক আলাপচারিতায় আমাদেরকে জানিয়েছিল।

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার পাইলসের অপারেশন হয়েছিল। এ সময় একদিন তার সাথে ফোনে কথা হয়। 'কেমন আছ' জানতে চাইলে সে তার পাইলসের অপারেশনের কথা বলেছিল। এর কিছুদিন পর হঠাৎ তার ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। ঢাকার ইবনে সীনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ফোনে তার সাথে একবার কথা হয়। সে আকুতি জানিয়ে বলে, 'নূরুল ভাই! আমার অবস্থা ভালো না। আপনারা আমার চিকিৎসার জন্য যা যা করণীয় তা করেন। আর আমার জন্য দো'আ করেন, আল্লাহ যেন আমাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন'।

কথাগুলো যখনই মনে পড়ে তখন বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠে। আমরা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, 'চিকিৎসার অর্থের যোগান নিয়ে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী যা যা করণীয় তা করব ইনশাআল্লাহ'। আসলেই তার চিকিৎসার জন্য অর্থের কোন অভাব হয়নি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', নওদাপাড়া মাদ্রাসার সাবেক ও বর্তমান ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ, বাঁকাল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ, রাবির আরবী বিভাগে তার সহপাঠীবৃন্দ, প্রবাসী ভাইয়েরা সবাই তার সাহায্যে ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছিল। যা ছিল অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে কারো চিকিৎসা সহায়তায় এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গেছে বলে আমরা জানি না। তার চিকিৎসার সব আয়োজনই চলছিল ঠিকঠাক। কিন্তু ওদিকে তার জীবনঘড়ির কাঁটা তার নির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত যাত্রার সংকেত দিচ্ছিল। তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছিল। সেজন্য কোন আয়োজনই তার বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট হয়নি। অবশেষে ৩৮ বছরের তরুণ আব্দুছ ছামাদের জীবনপ্রদীপ ২৭শে মে রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে দপ করে নিভে গেল। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে সে চলে গেল তার আপন ঠিকানায়।

প্রত্যেককে একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কিন্তু আব্দুছ ছামাদ আমাদের ছেড়ে এতো তাড়াতাড়ি এভাবে চলে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারিনি। বার বার তার স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠছিল। আপনজন হারানোর বেদনায় মনের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল।

পরদিন তার জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য সাতক্ষীরায় গমন করি। জানাযায় তার সাড়ে চার বছরের চটপটে ও ফুটফুটে পুত্র সন্তান আফীফ আব্দুল্লাহ ফুয়াদকে দেখে দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। সে তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, কি মূল্যবান জিনিস তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। সে জীবনের মতো পিতৃত্বের স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হ'ল। সে যত বড় হবে ততই পিতার শূন্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আব্দুছ ছামাদের পিতাও একই রোগে আক্রান্ত হয়ে এই বয়সেই তাকে রেখে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার সন্তানকেও একই পরিস্থিতির শিকার হতে হ'ল।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র কাছে বিনম্র প্রার্থনা, আমাদের এই প্রিয় ভাইটিকে তিনি যেন তার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে পরকালীন জীবনে তাকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করেন। জান্নাতুল ফেরদাউস যেন হয় তাঁর চিরস্থায়ী নিবাস। সাতক্ষীরা থেকে ফেরার আগে আমরা তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎকালে বিশেষত তার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যা যা করণীয় তা করার আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম। আমরা দো'আ করি, তাঁর সন্তানকে যেন আল্লাহ 'নেক সন্তান' হিসাবে কবুল করেন।-আমীন!

করোনাকালে মানবসমাজের জীবনমান উত্তরণে করণীয়

-মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম শনাক্ত হওয়া সেই করোনা ভাইরাসের ঢেউ আজ সারা বিশ্বের ১৯০টিরও বেশী দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। যা মূলত মানুষের কর্মেরই ফল। বিশ্ব চিরাচরিত যে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবী বিগত দশকগুলোতে যে অগ্রগতির ধারায় এগুচ্ছিল, কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যাপকভাবে তার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ইতিপূর্বে পৃথিবী আরও অনেক মহামারির শিকার হয়েছে। যেমন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে প্লেগ অব এথেন্স, ৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ার প্লেগ, ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্ল্যাক ডেথ, কলেরা, এশিয়ান ফ্লু, গুটি বসন্ত, এইচআইভি, সার্স, ইবোলা, স্প্যানিশ ফ্লু এরকম আরো অসংখ্য রোগ। কিন্তু তা আজকের ন্যায় পুরো পৃথিবীব্যাপী ছিল না। বরং তা কোন দেশ বা অঞ্চল ভিত্তিক সীমাবদ্ধ ছিল।[১] যার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় ভঙ্গুরতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে অধিকাংশ মানব সমাজের জীবনমান এক অচল অবস্থার শিকার হয়েছে।

করোনাকালে মানুষের জীবনমান :

ক. দিনমজুরদের অবস্থা : করোনা ভাইরাসে শুধু স্বাস্থ্য ঝুঁকি নয়, বরং গোটা বিশ্বের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়েছে। করোনা প্রতিরোধে প্রচলিত লকডাউন থাকার ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী কয়েক কোটি মানুষের আহারের চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২০ ও ২০২১ এই দুই বছরে সারা বিশ্বের ১১ থেকে ১৫ কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে যেতে পারে। যেখানে বাংলাদেশেই দুই কোটি ৪৫ লাখেরও বেশী মানুষ নতুনভাবে গরীব হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) বলেছে, কোভিড-১৯-এর কারণে দারিদ্র্যতার হার ১৯ থেকে ২৯ শতাংশ হয়েছে।[২]

খ. কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবস্থা : আমরা জানি যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি বড় খাত হচ্ছে কৃষি, শিল্প এবং সেবাখাত। প্রত্যেকটির আবার উপখাত রয়েছে। দেশী এবং বিদেশী অর্থনীতি অবরুদ্ধ থাকার কারণে দ্রব্যের মূল্যের উপর নিম্নমুখী প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ফলে অর্থনীতিতে প্রতিদিন প্রায় ২'শ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। শিল্প খাতে প্রতিদিনের অনুমিত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাযার ১ শত ৩১ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক ক্ষতি সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে সেবাখাতে। যেহেতু সেবাখাতের পরিধি ব্যাপক। তাই এর ক্ষতির আকারও বৃহৎ। সব মিলিয়ে সেবা খাতের দৈনিক অনুমিত ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২ হাযার কোটি টাকা।[৩]

গ. বেসরকারি চাকুরিজীবীদের অবস্থা : করোনা মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রতি দু'জনের একজনের আয় কমেছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ বলছে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশসহ ৫৭টি দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ বলেছে, মহামারীতে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। গ্যালাপ ১১৭টি দেশের ৩ লাখ মানুষের উপর জরিপ চালিয়ে জানায়, করোনা মহামারীর কারণে তাদের মধ্যে অর্ধেক মানুষের আয় কমে গেছে। তবে এমনটি বিশ্বের প্রায় ১৬০ কোটি মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

গবেষকরা এক বিবৃতিতে বলেন, আয় কমে যাওয়া বা চাকরি হারানোর এই হার থাইল্যান্ডে বেশী, যা ৭৬ শতাংশে পৌঁছেছে। আর সুইজারল্যান্ডে এই হার কম, যা ১০ শতাংশে রয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪ শতাংশ মানুষও কর্মহীন হয়ে পড়েছে।[৪]

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) বলেছে, বাংলাদেশের জিডিপি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে ১.১ ভাগ কমে যেতে পারে। তাদের হিসাবে এতে মোট ৩০০ কোটি ডলারের ক্ষতি হবে, ৮ লাখ ৯৪ হাযার ৯৩০ জন চাকরি হারাবে।[৫]

ঘ. সরকারী চাকরিজীবীদের অবস্থা : মহামারীর এই লকডাউন চলাকালে শ্রমজীবী মানুষের যেখানে দিনে সামান্য অর্থ উপার্জন ও আহার যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারী চাকরিজীবিদের জীবন যাত্রার মান পূর্বের অবস্থাতেই রয়েছে। কর্ম হারানোর অসুবিধা বিন্দুমাত্র তারা আঁচ করেনি।

ঙ. শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের অবস্থা : বিশ্ব চিরাচরিত যে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল মানুষ, কোভিড-১৯-এর কারণে আগামী প্রজন্মের স্বপ্নসৌধ নির্মাণের মূলকেন্দ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বিঘ্নিত হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে শিক্ষা ব্যবস্থায় এতবড় আঘাত এটাই প্রথম। গত বছরের জুলাই পর্যন্ত ১৬০ টিরও বেশী দেশের স্কুল বন্ধ ছিল। এতে ১০০ কোটিরও বেশী শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

---

১. *যুগান্তর : ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১।*
২. *ঐ।*
৩. *www.du.ac.bd ।*
৪. *আত-তাহরীক/জুন ২০২১।*
৫. *https://m.dw.com।*

থাকায় মোট শিক্ষার্থীর ৯৪ ভাগ কোন-না কোনভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছে।[৬]

সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিডের কারণে বিশ্বের প্রায় ২.৫ কোটি শিশু কখনো শিক্ষার আলো দেখবে না। এদিকে জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, মহামারীতে ক্ষতির শিকার প্রায় ১৬ কোটি শিশু। এভাবে জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফের গত ২৪শে আগষ্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বংলাদেশে করোনা মহামারির পুরোটা সময় জুড়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। কোভিড-১৯এর কারণে স্কুল বন্ধের ক্ষেত্রে বংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘ। এই বন্ধের ফলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত চার কোটির বেশী শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৭] দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিশু-কিশোরদের মাঝে বিভিন্ন অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন- চুরি, ছিনতাই, আত্মহত্যা, মারামারি, পালিয়ে গিয়ে বাল্য বিবাহ, অসামাজিক বিবাহ, এমনকি কিশোরগ্যাং-এর মত অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে সমাজ এক অশান্ত ও অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে।

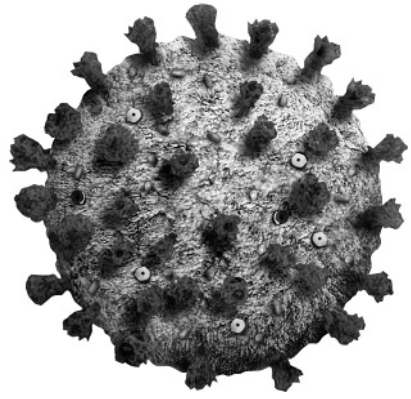

কোভিড-১৯-এর কারণে ৮০ শতাংশের বেশী শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় করোনাকালীন শিক্ষাকার্য যাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্য আন্ত র্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ রেডিও, টিভি ও ইন্টারনেটে লাইভ ক্লাস এবং অ্যাসাইনমেন্ট জমাদানের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ'ল, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের জন্য ইউনিসেফের দেওয়া পরামর্শ বা উদ্যোগ কতটা কার্যকর হবে তা অনুমেয়। যেখানে অনেকেরই উন্নত মোবাইল, টিভি, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের মত এসব জিনিস নেই।

এসব প্রযুক্তি হাতের নাগালে আসার ফলে শিশুরা লাইভ ক্লাসের নামে বা ক্লাসের অপেক্ষায় থেকে ইন্টারনেট জগতে প্রবেশ করে ফেইসবুকসহ বিভিন্ন গেইম যেমন- পাবজি, ফ্রি-ফায়ার ইত্যাদিতে আসক্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে তরুণ সমাজ অধঃপতনের অতল গহব্বরে নিপতিত হচ্ছে।

অনলাইন লেখাপড়ার যেমন অনেক অসুবিধা রয়েছে, তেমনি স্বাস্থ্যগত অনেক সমস্যার আশংকা রয়েছে। স্বাস্থ্যবিদদের তথ্য অনুযায়ী অনলাইনে ক্লাসের ফলে হিতে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হবার আশংকা বেশি। এতে দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে দৃশ্যমান প্রযুক্তির দিকে তাকিয়ে থাকায় চোখ, মন, মগজ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। অথচ এর বিপরীতে সরাসরি পাঠদান মানসিক গঠনের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতি এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

চ. চাকরি প্রত্যাশীদের অবস্থা : করোনাভাইরাস মহামারীতে কেবল শ্রমজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীরাই মহাসংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করছে না, বরং চাকরি প্রত্যাশীরাও মহাসংকটে রয়েছেন। যাদের অনেকেই প্রাইভেট-টিউশনি করে কোনরকম চলত, আজ তাদের সেই শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে পিতা-মাতার নিকট বোঝায় পরিণত হয়েছে। এদিকে পিতা-মাতা আশায় বুক বেঁধে আছেন সন্তান লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পেয়ে সংসারের হাল ধরবে। সন্তান ভাবছে চাকরি পেয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমতে মনোনিবেশ করবে। কিন্তু না, সে আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এক গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, করোনাকালে দীর্ঘদিন কোন প্রকার সার্কুলার ও নিয়োগ না থাকায় সরকারী চাকরিতে প্রবেশের বয়স হারিয়েছে ২ লাখ চাকরি প্রত্যাশী। যেখানে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী বাংলাদেশের চাকরির বাজারে যোগদান করেন। করোনায় অনেকের বয়সসীমা অতিক্রম করেছে। এখন কি হবে এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর?

সংকটময় মুহূর্তে করণীয় :

আল্লাহ্র উপর ভরসা : আল্লাহ্র উপর ভরসা মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় একটি বিষয়। যা ব্যতীত তাঁর নৈকট্য হাছিল করা যায়না। যাকে দ্বীনের অর্ধেক হিসাবে গণ্য করা হয়। করোনা মহামারীতে আমাদের উচিত আরো বেশি তাক্বওয়া অর্জন করা। করোনা মহামারী থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করা। বিপদে আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকলে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন' *(ত্বালাক্ব ৬৫/৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, বান্দা যদি কোন পাহাড় সরাতে আদিষ্ট হয় আর যদি সে কাজে সে আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়ও সরিয়ে দিতে পারবে।[৮]

৬. যুগান্তর : ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১।
৭. প্রথম আলো: ২৭আগষ্ট ২০২১।
৮. মাদারিজুস সালিকীন ১/৮১।

এছাড়াও এমতাবস্থায় মানসিক দৃঢ়তাও প্রবলভাবে দরকার। করোনায় আতঙ্কিত না হয়ে বিপদে ধৈর্য ধারণ ও নিজের উপর আস্থা রেখে সব সময় নেতিবাচক চিন্তা বাদ দিয়ে সর্বত্রভাবে আল্লাহ ভরসা করতে হবে।

জীবনমান উত্তরণে করণীয় :

মানবসমাজের জীবনমান উত্তরণে সবাইকে এক যোগে এগিয়ে আসতে হবে এবং মানবতার বৃহত্তর সেবায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন, আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

এছাড়া হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে আল্লাহ তা'আলাও ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন'।[৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার কোন মুমিন ভাইয়ের একটি কষ্ট বা বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলাও ক্বিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দিবেন'।[১০]

'বর্তমানে মানুষ মানুষের সহযোগিতার মানসিকতা থেকে বিমুখ হয়ে নিজেরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হচ্ছেন। যার দিকে ইঙ্গিত করে কবি মুছত্বফা লুত্বফী আল-মান ফালুত্বী বলেন- بطنه الغني انتقام لجوع الفقير 'ধনীদের অতিভোজ জনিত পীড়া ক্ষুধার্ত দরিদ্রের প্রতিশোধ মাত্র'।[১১]

ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ : করোনাকালীন সংকটময় পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিত্তশালী ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানব সেবার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন অনেকেই। আপনিও হ'তে পারেন তাদের একজন। যেমন তাদের অন্যতম হাজী মুহাম্মাদ মুহসীন, হাজী মুহাম্মাদ দানেশ, নওয়াব সলীমুল্লাহ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনক হিসাবে খ্যাত মাহাত্মা গান্ধী ও আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মাদার তেরেসাসহ আরো অনেকেই।

খ. সামাজিক উদ্যোগ : করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য সামাজিক বিভিন্ন সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে' *(আল-ইমরান ৩/১১০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের কল্যাণ সংশ্লিষ্ট যত কাজ আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাবার দান করা'।[১২]

গ. রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগ : বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য সরকারীভাবে ব্যাপকহারে সহায়তা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে এ খাতের জন্য আলাদা উচ্চতর বাজেট নির্ধারণ করে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতে হবে। দুর্নীতি ও আত্মসাৎকারী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি বিধান করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপক সহায়তার জন্য করোনাকালীন সরকারকে কিছু নবপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যেমনভাবে অন্যান্য দেশেও এধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে প্রথম এ ক্ষেত্রে সরকারী চাকরিজীবী ও অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[১৩]

ঘ. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উদ্যোগ : করোনাকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অতিব যরূরী। একই সাথে সব দেশ ব্যাপক ক্ষতির শিকার নয়। তাই তুলনামূলক অধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতা দানের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো (WHO, OIC, G-7 ইত্যাদি)-কে সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

উপসংহার : সর্বাগ্রে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, রোগ আল্লাহ্র সৃষ্টি। মুক্তি দেওয়ার মালিকও তিনি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ পাঠাননি, যা আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি।[১৪] করোনা প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক উপকরণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রদান করেছেন, যা সুষ্ঠু গবেষণার মাধ্যমে বের করতে হবে। আল্লাহ্র রহমতে ইতোমধ্যে অনেক দেশ ভ্যাকসিন তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। যা মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সুসংবাদও বটে। অতএব মানবসমাজের জীবনমান উত্তরণে দরকার দায়িত্বশীল, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইখলাছপূর্ণ আন্তরিকতা ও পরিকল্পনা মাফিক কাজের পরিধি তৈরী করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

[লেখক : এম. ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

৯. মুসলিম হা/২৬৯৯।
১০. মুসলিম হা/তিরিমিযি ১৪২৫; ইবনু মাজাহ ২২৫।
১১. https://al-maktaba.org/book/11400/82।
১২. বুখারী হা/১২।
১৩. দৈনিক ইত্তেফাক ৩১ মার্চ ২০২০।
১৪. বুখারী হা/৫৬৭৮।

শায়খ নে'মাতুল্লাহ তুর্কী

-ফরীদুল ইসলাম

[শায়খ নে'মাতুল্লাহ তুর্কী তুরস্কের একজন বিখ্যাত আলেম এবং ইসলাম প্রচারক। গত ৩১শে জুলাই ২০২১ তিনি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে মৃত্যুবরণ করেন। বরেণ্য এই দাঈ ইলাল্লাহ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান জানিয়ে। জনপ্রিয় কোন বক্তা বা শিক্ষক তিনি ছিলেন না, ছিলেন না মিডিয়া ব্যক্তিত্ব; কিন্তু বহু মানুষ তাঁর দাওয়াতে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছেন। ধন্য হয়েছে এক নতুন জীবনের দিশা পেয়ে। বক্ষমান নিবন্ধে এই মহান দাঈ'র সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হ'ল।- নির্বাহী সম্পাদক]

জন্ম ও শিক্ষাজীবন : শায়খ নে'মাতুল্লাহ ইবরাহীম ইয়ার্ট তুর্কী আনুমানিক ১৯৩১ সালে আধুনিক তুরস্কের দক্ষিণ আমাসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহির্বিশ্বে নে'মাতুল্লাহ খোজা নামেই অধিক পরিচিত। ছোটবেলায় তাঁর বোনের কাছে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। বড় বড় আলেমদের ছোহবত, দ্বীনী মজলিসে যাওয়া-আসা এবং সেখান থেকে তিনি জীবন চলার পাথেয় হিসাবে প্রচুর তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়াও ওছমানী সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান আব্দুল হামীদের শাসনামলে অনেক আলেমের কাছে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। তিনি বিংশ শতাব্দীর একজন প্রাজ্ঞ আলেম ও দাঈ ছিলেন।

কর্মজীবন : মক্কার জাবালে হেরা প্রান্তরে 'আন-নূর' মসজিদের ইমাম হিসাবে ১৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মদীনার একটি মসজিদেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ১৫ বছর ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত 'সুলতান আহমাদ' মসজিদসহ অনেক মসজিদের ইমাম ও মুয়াযযিন হিসাবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ : ইউরোপ ও এশিয়ার ৫৫টিরও বেশী দেশে তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কাজ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ১০০টির অধিক মসজিদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাইবেরিয়াসহ রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যেও শুধুমাত্র সাদা জুব্বা পরে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

জাপান, কোরিয়া ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের হাযার-হাযার লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি জাপানে তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রায় ৪০১টি মসজিদ ও প্রার্থনা হল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা জাপানের কিছু চ্যানেলে প্রর্দশিত হলে তা দেখে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি ৬টি ভাষা জানতেন। শাহ নে'মাতুল্লাহ তুর্কীর ঘনিষ্ট বন্ধু ওমর ফারুক আওযাকযাদাহ বলেন, ইসলাম প্রচারের সহজতার জন্য তিনি তুর্কী, আরবী, ফারসী, উর্দূ, আলবেনিয় সহ ইংরেজীতেও ইসলামের দাওয়াত দিতেন। স্থানীয় ভাষায় ইসলামের পরিচিতিমূলক ছোট কার্ড ও বই প্রস্তুত করে সব সময় নিজের পকেটে এসব বই রাখতেন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা বিতরণ করতেন। সব স্থানে, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি ছিল খুবই সরল। একটি ছোট ছাপানো কার্ড তাঁর হাতে থাকত, যেখানে লেখা থাকত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। আর সাথে নয়টি ভাষায় বাক্যটির অনুবাদ উল্লেখ করা থাকত। অমুসলিম যার সাথেই তাঁর দেখা হ'ত, তিনি কার্ডটি দিতেন। যারা কার্ডটি পড়ার পর তাঁর কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইত, তিনি তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতেন। এভাবেই ইসলামের প্রতি তাঁর দাওয়াতের সূচনা হ'ত। শুধু জাপানেই তাঁর প্রভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়।

টোকিওতে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা : শায়খ নে'মাতুল্লাহ জাপানে প্রায় ১৫ বছর অবস্থান করেন। এ সময় রাজধানী টোকিওতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান ইসলামিক সেন্টারের প্রধান ড. ছালেহ সামেরী বর্ণনা করেন, শায়খ নে'মাতুল্লাহ জাপানে ১৪ বছরের বেশী অবস্থান করেন। এ সময় তিনি উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত চষে বেড়িয়ে অসংখ্য মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। তাঁর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর দাওয়াতে অসংখ্য মানুষ সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রতিদিন ইসলামের পরিচিতিমূলক ছোট বইয়ের শত শত কপি বিতরণ করতেন। সকাল-সন্ধ্যা মানুষ ইসলামিক সেন্টারে এসে তার কথা শুনত। পথে, বাযারে, স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলতে-ফিরতে তিনি ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকতেন।

চীনে ২০ হাযার কুরআনের কপি প্রেরণ : কম্যুনিস্ট মতবাদের দেশ চীনেও তিনি তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। যেখানে মুসলমানদের সমস্ত ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি ছালাত, ছিয়ামের মত ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদতগুলোর উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়। পবিত্র কুরআন পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এমন প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি ১৯৮১ সালে চীন সরকারের অনুমতিক্রমে দেশটিতে ২০ হাযারের বেশী পবিত্র কুরআনের কপি পাঠিয়েছেন। যা সত্যিই অবিশ্বাস্য!

মদশালা থেকে ইসলামের পথে : নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছে বিচিত্র পদ্ধতিতে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে

ধরতেন তিনি। থাইল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের মদের বার থেকে অসংখ্য নেশাগ্রস্ত মানুষকে মসজিদে আঙিনায় নিয়ে আসেন তিনি। মানুষের কাছে সহজভাবে হাসিমাখা মুখে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়া ছিল তুর্কী এই আলেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মক্কায় 'আন-নূর' মসজিদে দায়িত্ব পালনকালে এক লোক শায়খকে সালাম প্রদান করে তাঁর কপালে চুমু দেন। যেন শায়খ তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত। এরপর লোকটি হেসে বলল, শায়খ, আমি ঐ তরুণদের একজন, যাদের আপনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার একটি মদের বারে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আপনার কথা শুনে আমি জীবন পরিবর্তনের তাওবা করেছি এবং সব সময় আপনার জন্য দো'আ করেছি।

১৯৭৯ সালে শায়খ নে'মাতুল্লাহ জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের একটি মসজিদ যান। তিনি স্থানীয় তুর্কীদের বাকি মুসলিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আমরাই পুরো সময় আপনার কথা শুনব। কিন্তু তিনি বার বার বাকিদের কথা জিজ্ঞেস করায় তারা মদের বারে আছে বলে জানানো হ'ল।

শায়খ স্থানীয় একজনকে নিয়ে বারে যান। প্রায় ৪০ জন সেই বার পরিচালনা করে। শায়খ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মুজাহিদগণ, আস-সালামু আলাইকুম'। মুজাহিদ বলায় সবাই একে অপরের দিকে তাকাল। শায়খ বললেন, 'আপনারা তিন কারণে মুজাহিদ'। **প্রথম কারণ :** জার্মানীতে আপনারা ইসলামী নাম ধারণ করে চলাফেরা করেন, যা মানুষকে ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। **দ্বিতীয় কারণ :** আপনারা নিজ পরিবারের রুযী-রোযগারের জন্য জার্মানীতে এসেছেন। এটাও জিহাদের অংশ। **তৃতীয় কারণ :** আপনাদের পূর্বপুরুষ ওছমানীয়রা মুজাহিদ ছিলেন। আপনারা তাদের উত্তরসূরী।

অতঃপর শায়খ বলেন, আমি মদীনা থেকে আপনাদের জন্য একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। এরপর তিনি তাদের ইসলামের পথে ফিরতে উৎসাহিত করে কুরআন ও হাদীছের অনেক কথা বলেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শুনে উক্ত ৪০ জনের সবাই জাহেলিয়াতের জীবন ছেড়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে জীবন যাপন শুরু করার শপথ করেন।

তিন বছর পর শায়খ একদিন মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। পাগড়ী মাথায় এক তুর্কী এসে জিজ্ঞেস করল, শায়খ আপনি আমাকে চেনেন? তিনি বললেন, কেন চিনব না। তুমি হয়ত তুরস্কের বড় কোনো ইমাম বা আলেম হয়ে থাকবে! লোকটি বলল, শায়খ, হাযার বছর গেলেও আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি বার্লিনের মদের বারের শেষ ব্যক্তি। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মদশালা থেকে দুজন লোক আমাকে মসজিদে নিয়ে যায়। আপনি আমার মাথা স্পর্শ করে বলেছিলেন, 'আপনার মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। তিনি আপনাকে তাঁর ঘরের জন্য কবুল করেছেন। আমি নেশাগ্রস্ত হলেও আপনার কথা বুঝতে পারি। এরপর নিজের জীবন পরিবর্তন করে নিয়মিত ছালাত আদায় শুরু করি। সস্ত্রীক ওমরাহ পালন করে ফের আপনার সান্নিধ্যে এসেছি।

সব মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা : রাতের বেলা টোকিওর কেন্দ্রীয় মসজিদে তিনি মানুষকে ছালাতের জন্য ডেকে আনতেন। কারো সঙ্গে তার কোনো বিরোধ-বৈরী মনোভাব ছিল না। সব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিমগ্ন থাকতেন। সবার কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। তিনি কারো প্রতি অভিশাপ বা বদ দো'আ করতেন না। বরং সবার জন্য কল্যাণের দো'আ করতেন। তিনি দো'আয় বলতেন, 'হে আল্লাহ, ইসলামের শত্রুদের হেদায়াত দিন। ইসলামের শত্রুদের বিদ্বেষকে ওমর (রাঃ), খালিদ (রাঃ), ইকরামা (রাঃ)-এর মতো পরিবর্তন করে তাদেরকে ইসলামের সহযোগী হিসাবে কবুল করুন।

মৃত্যুবরণ : মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হ'লে নে'মাতুল্লাহ খাযা ইস্তাম্বুলে একটি অপারেশন করিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইস্তাম্বুলের 'সারি ইয়ার' মসজিদে তাঁর ছাত্রদের পাঠদান বন্ধ করেননি। অবশেষে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই নাযুক হয়ে পড়লে তাকে ইস্তাম্বুলের 'গেনকেলকয়' হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তিনি ৩১শে জুলাই ২০২১ মারা যান এবং রবিবারের দিন তাকে 'আইয়ূব সুলতান' কবরস্থানে দাফনের পূর্বে 'আল-ফাতেহ' মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

যমীনের উপর মাটি বা পশমের একটি ঘরও বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না। সে লক্ষ্যে শায়খ নে'মাতুল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছেন। তিনি দুঃখবোধ করতেন এবং আকুতিভরা কণ্ঠে বলতেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি নবীর মুখের দিকে কিভাবে তাকাব? আমাকে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে বলা হয়েছিল'। মহান আল্লাহ তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন-আমীন!

[লেখক : ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী]

মাওলানা মুহাম্মাদ বদীউযযামান

-মুহাম্মাদ রুকনুযযামান

[বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন এমন আলেম, শিক্ষক, লেখক বা সংগঠক রয়েছেন অসংখ্য। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যকের নাম হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের নাম কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে কিংবা বিস্মৃতির পথে রয়েছে, অথচ তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একেকটি প্রদীপ্ত মশাল। এসকল ব্যক্তিত্বের স্মৃতি জাগরুক রাখতে ***'স্মরণীয় আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব'*** *শিরোনামে 'তাওহীদের ডাক'-এ নতুন একটি কলাম চালু করা হ'ল। বর্তমান সংখ্যায় আমরা এমনই একজন জ্ঞানতাপস মনীষীর জীবনী উল্লেখ করব, যিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সম্মানিত মুহাদ্দিছ হিসাবে দীর্ঘদিন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অসংখ্য আলেমের উস্তায হিসাবে 'উস্তাযুল আসাতিযাহ' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি হ'লেন* ***মাওলানা মুহাম্মাদ বদীউযযামান*** *(১৯৩৯-২০১২খ্রী.)। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হল- নির্বাহী সম্পাদক]*

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মুহাম্মাদ বদীউয্যামান। পিতার নাম আলহাজ্ব জারজীস মণ্ডল। মাতার নাম দিল রওশন এবং দাদা আলহাজ্ব মৌলভী মুহাম্মাদ আইনুদ্দীন।

জন্ম : মাওলানা বদীউযযামান বাংলা ১৩৪৭ সাল মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলা সদরের আলাতুলী ইউনিয়নের রাণীনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় মক্তবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি স্থানীয় আলেম মাওলানা আব্দুর রউফের নিকট তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে তাঁর দাদা মৌলভী মুহাম্মাদ আইনুদ্দীন মণ্ডল খুব দ্বীনদার ও পরহেযগার আলেম ছিলেন। তিনি আলেম-ওলামাদের খুব কদর করতেন। তিনি দাদার বাড়িতে দুধেভাতেই বেড়ে উঠেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ভারতের দিলালপুরে পড়ালেখায় উদ্দেশ্যে গমন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ময়মনসিংহের 'বালিয়া মাদরাসা' থেকে দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি আলিয়া নেছাবের ফাযিল পর্যন্ত ডিগ্রী লাভ করেন। তার শিক্ষাজীবন ছিল খুব সংগ্রামের। কেননা তিনি পড়াশোনা শেষ করার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। তিনি প্রায়শঃ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নিজের জীবনের বাঁকে বাঁকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কথা ছাত্রদের শুনাতেন।

পেশাজীবন : ১৯৭০ সালের দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বার রশিয়া মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। এরপর তিনি উজানপাড়া (গোদাগাড়ী, রাজশাহী), দারুলহাদীছ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), আলাদীপুর মাদ্রাসা (নঁওগা) ও গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি মাদ্রাসায় জীবনের ২২টি বছর অতিবাহিত করেন। সর্বশেষ ১৯৯২ সাল থেকে মৃত্যু অবধি আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসায় 'আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া, রাজশাহীতে মুহাদ্দিছ হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছরে সোনালী সময় অতিবাহিত করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনাধীন 'দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এ ১৯৯৮ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীকে-এ নিয়মিত ফৎওয়া লিখতে গিয়ে তিনি স্বীয় ছাত্রদেরকে নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তিনি এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা অতুলনীয়। উর্দূ ভাষায় ইলম চর্চার কারণে বাংলা ভাষায় ফাতাওয়া লিখতে গিয়ে কলম সৈনিক হিসাবে তার প্রিয় ছাত্রদের সহযোগিতা নিতেন, যাতে করে ফৎওয়া যথেষ্ট মানসম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে ছাত্রদের সাহায্য নিতে তাঁর সামান্যতম দ্বিধা বা অহংবোধ কাজ করত না। এমন দিলদরদী শিক্ষক পাওয়া সত্যিই দুর্লভ।

গুণাবলী : মাওলানা বদীউযয্যামান একজন বা-আমল আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পাবন্দী, ক্লাসে সকল শিক্ষকের আগে উপস্থিতি, ক্লাসের পূর্বে ভালোভাবে মুতা'আলাহ দেখা, ছাত্রদের ভালভাবে জ্ঞানদানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। শীত, বর্ষা, গরম- যে কোন ঋতুতেই মারকায মসজিদে ইমামের পেছনে যদি কোন মুছল্লীকে দেখা যেত তিনি হতেন মাওলানা বদীউয্যামান। নাহু, ছরফ এবং তাফসীরে জালালাইনসহ বড় ক্লাসের বইগুলো তিনি খুব যত্ন সহকারে পড়াতেন। কোন ছাত্রের আরবী ব্যাকরণের উচ্চস্তরের কিতাব যেমন কাফিয়া, ফুছূলে আকবরী পড়া না থাকলে তাকে এ কিতাবগুলো তার নিকট শিখে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যার ক্লাস অন্য কোন শিক্ষক নিতেন, সেগুলো তাঁর কাছে আরো ভাল করে পড়ে নেওয়ার আহ্বান জানাতেন। ক্লাসের বাইরে পড়িয়ে তিনি কারো কাছে কোনদিন পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। সদ্যপ্রসূত সন্তানের দুগ্ধদানকারী মায়ের মত জাতির বৃহত্তর খেদমতে ছাত্রকে ভাল আলেম বানাতে হবে- এ চিন্তা সারাক্ষণ তাকে তাড়া করত। ছাত্রকে পড়াশোনায় অভ্যস্ত করানোর জন্য ঘরে, বাইরে, ক্লাসে যেখানেই পেতেন, পুরোমাত্রায় পড়াশোনার খোঁজ-খবর নিতেন। ছাত্ররা নতুন বিষয়ে কোন কিছু জানতে চাইলে তিনি বই-পুস্তক ঘেটে প্রমাণপঞ্জী সহকারে আদরের সাথে তা তাদের জানিয়ে দিতেন। এক্ষেত্রে কোনদিন তিনি ন্যূনতম বিরক্তি বোধ করেননি। ছাত্র পাগল উস্তাদজী অনেক সময় মেধাবী ছাত্রদেরকে ভালবেসে প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত একশ নম্বরের চেয়ে বেশী নম্বর দিয়ে দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে

রসিকতা করে বলতেন, সে আসলেই বেশী নম্বর পাওয়ার যোগ্য। পূর্ণ মুতা'আলাহ করে তবেই তিনি ক্লাসে যেতেন। ইলমী সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন বই মুতা'আলাহ না করে তিনি এক কদমও সামনে বাড়তেন না। কোন বিষয়ে ছাত্ররা পড়তে মজা পেয়ে নাছোড়বান্দা হ'য়ে আরো পড়তে চাইলে সহৃদয়বান উস্তাদজী মুতা'আলাহ ছাড়া পড়ানোকে শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় ইলমী খিয়ানত বলে উল্লেখ করতেন। বিষয় সংশ্লিষ্ট পুরনো উস্তাদদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পরহেযগারিতার মজাদার গল্প তিনি ছাত্রদের শুনাতেন, যা শারঈ পাণ্ডিত্য অর্জনে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করত। তেমনই একটি গল্প এখানে উপস্থাপন করা হ'ল। যেমন- তিনি ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান মাওলানা ওহীদুযযামানের অনুবাদকৃত মুসলিম শরীফ থেকে একটি গল্প বর্ণনা করেছিলেন।

আফগানিস্তানে একটি মাদ্রাসার একজন ছাত্র উস্তাদের কাছে ইবতেদায়ী থেকে দাওরা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। দাওরা ফারেগ হওয়ার শেষ ক্লাসে ছাত্র ভাবল, উস্তাদজী আমাকে এত বড় আলেম বানালেন, তাহ'লে তাকে পুরস্কার কি দেওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে সে উস্তাদকে সরাসরি 'জান্নাত' পুরস্কার দেওয়ার মনস্থ করল। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সে হঠাৎ করে আগে থেকেই পকেটে রাখা চাকুটি বের করে উস্তাদের গলায় ধরল। উস্তাদ তো তার কর্মকাণ্ডে হতবাক। সে বলল, উস্তাদজী, আপনি তো আমাকে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা দিয়েছেন, তাই আপনাকে আমি একবারে আল্লাহ্র জান্নাত দান করতে চাই। উস্তাদ প্রশ্ন করল, সেটি কিভাবে? সে বলল, আপনাকে আমি খুন করব। ফলে মহান আল্লাহ বিচার দিবসে আপনাকে খুন করার অপরাধে আমাকে জাহান্নাম দিবেন। আর আপনি বিনা হিসাবে আল্লাহ্র জান্নাতে চলে যাবেন। উস্তাদ তার পাগলামী বুঝতে পেরে বলল, আমাকে মৃত্যুর আগে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত পড়ার শেষ ইচ্ছা পূরণ কর। উস্তাদ টয়লেটে গিয়ে বাইরের লোকজনকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। পরে বাইরের মানুষরা এসে ছাত্রের এমন ভুল সিদ্ধান্ত আর পাগলামী থেকে উস্তাদকে রক্ষা করলেন।

ছাত্রগণ : দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী শিক্ষার্থী রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

১. মাওলানা আব্দুল খালেক (মুহাদ্দিছ, হিফযুল উলূম কামিল মাদ্রাসা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ২. মাওলানা আব্দুর রহীম (সাবেক প্রিন্সিপাল, জামে'আ চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ৩. মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব হাটহাজারী (পিন্সিপাল, কদমডাঙ্গা মাদ্রাসা, নওগাঁ) ৪. মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব লালবাগী (মুহাদ্দিছ, আলাদীপুর মাদ্রাসা, নওগাঁ) ৫. মাওলানা আব্দুল গফূর (মুহাদ্দিছ, হিফযুল উলূম) ৬. মাওলানা দুরুল হুদা (প্রভাষক হিফযুল উলূম) ৭. মাওলানা আফতাবুদ্দীন (সহকারী অধ্যাপক, পাঁচ টিকরী আলিম মাদ্রাসা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ৮. মাওলানা নাজমুল হক (সহকারী শিক্ষক, আলাদীপুর মাদ্রাসা) ৯. মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী) ১০. শায়খ সাঈদুর রহমান (প্রিন্সিপাল, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়াহ, রাণীবাযার, রাজশাহী) ১১. মাওলানা ফযলুল করীম (মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী) ১২. মাওলানা রুস্তম আলী (সিনিয়র শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী) ১৩. আকমাল হুসাইন মাদানী (সঊদী দাঈ এবং তদীয় বড় ছেলে) ১৪. ড. মুযাফফর বিন মুহসিন (পরিচালক, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, বাঘা, রাজশাহী) ১৫. ড. নূরুল ইসলাম (ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও সহকারী গবেষক, গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ১৬. ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (চেয়ারম্যান, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড ও পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) ১৭. ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর (পরিচালক, ইয়াসিন আলী সালাফিয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী) ১৮. আব্দুল আলীম মাদানী (প্রিন্সিপাল, জামে'আহ আস-সালাফিয়াহ, হাটাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ), ১৯. শরীফুল ইসলাম মাদানী (শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২০. ড. আব্দুল্লাহিল কাফী (পরিচালক, বাংড়া সালাফিয়া মাদ্রাসা, শেরপুর, বগুড়া), ২১. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক (অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ।

সন্তান-সন্ততি : তাঁর ৪ ছেলে ও ৪ মেয়েসহ মোট ৮ জন সন্তান রয়েছে। তাঁর ছেলেদের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ-

১. বড় ছেলে মুহাম্মাদ আকমাল হোসাইন মাদানী। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সঊদী সরকারের দাঈ ও শিক্ষক হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে কর্মরত আছেন।

২. মেজো ছেলে শামসুল আলম নারায়ণগঞ্জে ব্যবসার সাথে জড়িত।

৩. সেজো ছেলে আব্দুর রহীম নিজ গ্রামে ব্যবসার সাথে জড়িত।

৪. ছোট ছেলে মুহাম্মাদ রুকুনুযযামান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করে ৩৮-তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বর্তমানে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

মৃত্যু : তিনি ১৪ই নভেম্বর, ২০১২ রাত ৯-টায় তাঁর নিজ বাস গৃহে (মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

বস্তুবাদী দুনিয়ায় প্রাইভেট, কোচিং বাণিজ্যের যুগে এমন একজন নিঃস্বার্থ ও আদর্শবান শিক্ষক পাওয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। পাঠদানে প্রবল আগ্রহ ছাত্রদেরকে নতুন বিষয় শোখানো এবং ছাত্রদের প্রতি পিতৃতুল্য ভালবাসা তাকে প্রবাদপ্রতীম শিক্ষকে পরিণত করেছে। তিনি গত হয়েছেন প্রায় এক দশক পূর্বে, কিন্তু তাঁর ছাত্রবৃন্দ, তাঁর সহকর্মী শিক্ষকদের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসাবাণী অদ্যাবধি শোনা যায়। আজও তারা তাঁকে প্রাণভরে স্মরণ করেন এবং দো'আ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা এমন একজন নিখাদ দ্বীনের সেবক ও শিক্ষককে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব করুন।- আমীন!

[লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ]

করোনা বিপর্যয়ে ইসলামে ফিরলেন যারা

- আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

খাঁ খাঁ হৃদয়মরুতে যখন শরতের শিশিরে ভেজা ঘাসের ন্যায় স্বচ্ছ বসন্ত আসে, সে বসন্তের উদ্দীপনায় হৃদয়তন্ত্রীতে জাগে এক অদ্ভূত আলোর সঞ্চারণ। হৃদয়কাননে প্রস্ফুটিত এমনই এক শুভ্রতার নাম ইসলাম। পাপ পঙ্কিলতায় হাঁসফাঁস খেয়ে ক্লান্ত নাবিকেরা যখন পিছে রেখে আসা হতাশার দিকে তাকায়, ম্রিয়মান বৃক্ষ থেকে গজানো নতুন পল্লব স্বরূপ প্রস্ফুটিত ইসলাম তখন তাদের দেখায় নতুন আলোর হাতছানি। দিকভ্রান্ত মরীচিকা সদৃশ পাটাতন থেকে তখন জন্ম নেয় জীবনের নতুন অনুচ্ছেদ। পাপ-পংকিলতা আর হতাশার বলয় ভেঙে গায়ে অনুভূত হয় মুক্তির শীতল পরশ। নতুন করে লেখার প্রেরণা জাগে জীবনের নতুন জ্যামিতি।

একথা সর্বজনসিদ্ধ যে, পৃথিবীতে দ্রুত সম্প্রসারিত ধর্ম হ'ল ইসলাম। পিউ গবেষণা কেন্দ্রের তথ্যমতে, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্ম হবে ইসলাম।

২০২০ সালে এসে করোনার বিপর্যয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে পৃথিবী। সভ্যতার রঙিন চশমা খুলে পৃথিবীর নিদারুণ বাস্তবতা বুঝতে শিখেছেন অনেকেই। করোনার ভয়ে মাকে রেখে চলে গেছে সন্তানরা। আক্রান্ত হওয়া মাত্রই ব্যক্তিকে রেখে পালিয়েছে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি। দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন অনেকেই আবার দীর্ঘদিন পর পরিবারকে কাছ থেকে অনুভব করেছে। মোটকথা, জীবন যে হ'তে পারে নাটকের চেয়ে নাটকীয়, করোনা এসে এই বাস্তবিক হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছে চোখের পলকে। ফলশ্রুতিতে অনেকেই জীবনের মিথ্যা মোহ ত্যাগ করে বাস্তবতার সমীকরণ বুঝতে শিখেছে। ইসলামী আদর্শ বদলে দিয়েছে তাদের জীবনের রূপরেখা। ২০২০ সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এমন কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে আজ আমরা আলোচনা করব, যাদের তথ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে।

জেই পালফ্রে : জেই পালফ্রে একজন তরুণ মোটিভেশাল ইউটিউবার। এক সময় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। মূলত এটিই ছিল তার ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক ধাপ। প্রথমে তিনি মিশর, তুরস্ক, ইরাক, পাকিস্তানের মত আরো বহু দেশ ভ্রমণ করেন। এসব দেশ ভ্রমণের কারণে তিনি খুব দ্রুত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠেন। সর্বোপরি খুব কাছ থেকে ইসলামের সংস্পর্শে আসেন। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র তাওহীদের প্রতি অনুপ্রাণিত হন এবং একক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস করা শুরু করেন। ২১শে আগস্ট ২০২০ সালে ইউটিউবে তাঁর একটি ভিডিও বের হয়। সেখানে তাকে শাহাদাহ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখা যায়।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, 'যখন আমি পৃথিবী ভ্রমণ শুরু করি তখন অনেক আশ্চর্যজনক মানুষের সাক্ষাৎ পাই। আমি অনেক কিছু জানতে পারি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ইসলামী দেশগুলোতে ভ্রমণের কারণে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বুঝতে পারি এবং সত্য ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারি। ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার, শান্তিপূর্ণ কিন্তু ভুল বুঝাবুঝির ধর্ম।

এক সময় তিনি ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করতে কুরআন পড়া শুরু করেন। মিশরে থাকাকালীন রামাযান মাসে তিনি কিছু চমৎকার মানুষের সাক্ষাৎ পান, যারা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। পুরো রামাযান মাস জুড়ে তিনি মানুষের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুখ প্রত্যক্ষ করেন। আর এটিই ছিল তাঁর ইসলামে ফেরার গল্প।

উইলহেম ওট : করোনা বিপর্যয়ের প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে উইলহেম ওট একজন। উইলহেম ওট একজন ৩৮ বছর বয়সী অস্ট্রিয়ান বক্সিং যোদ্ধা (MMA Fighter)। তিনি MMA তে রৌপ্য বিজয়ীও বটে, একসময় তিনি নিজেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। জীবনের সংকটময় এই সময়টাতে ইসলামী বিশ্বাস এবং ভাবধারা তাকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা জোগায়। ১৬ই এপ্রিল ২০২০ সালে উইলহেম ওট ইসলাম গ্রহণ করেন। করোনা ভাইরাসের সংকটময় মুহূর্তেই মূলত তাঁকে ইসলাম গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করে।

বিয়ং চান : দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী সাবেক ফুটবলার বিয়ং চান। ব্যক্তি জীবনে হতাশা থেকে যে বয়সে তাকে নেশার ঘোরে পড়ে থাকার কথা ছিলো, সে বয়সে তিনি ইসলামে ফিরে এসেছেন। আসুন! তার নিজের মুখ থেকেই সে ঘটনাটি শুনে নেই।

'কৈশরের প্রারম্ভে আমি ছিলাম অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। একজন কর্মঠ ফুটবলার। একসময় অনুভব করলাম মানসিক ও শারীরিকভাবে আমি ভালো নেই। যদিও আমি মুহাম্মাদ সালাহ আর মেসুত ওজিলের ফ্যান ছিলাম। কিন্তু তারপরও খেলা চালিয়ে যাওয়ার মতো সাহস এবং অনুপ্রেরণা পাইনি। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবল খেলেছি। আমার ফুটবল ছেড়ে দেয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, আমার কাছে মনে হ'ল সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমি হতাশাগ্রস্ত ও পরাজিত হয়ে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছিলাম। ধৈর্য এবং আশাহত হয়ে ভাবছিলাম জীবনে হয়তো কিছুই করতে পারবো না। সুবহানাল্লাহ! তারপর পরিবর্তন হয়ে হাইস্কুল শেষ করে সেনাবাহিনীতে যোগদান করলাম। নিজের প্রচেষ্টায় ডিপ্লোমাও করলাম। এই সময়টাতে কিছু মুসলিমের সাথে

সাক্ষাৎ হ'ল। তারা আমার কথা শুনতো। আমাকে বোঝার চেষ্টা করতো এবং আমার অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতো। এই বন্ধুরা ধীরস্থিরভাবে আমার চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন ঘটাতে লাগলো। দিন থেকে সপ্তাহ গড়াতে লাগলো। তখন আমরা সব বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করতাম। বিশেষত ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমার অনেক প্রশ্ন ছিলো। তারা আমাকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতো এবং সমস্যাগুলো সমাধান করতো। এরপর আমি নিজের চেষ্টায় ইসলাম অধ্যয়ন শুরু করলাম। কুরআন পড়তে জানিনা তাই শুনতে শুরু করলাম। যখন ঘুমাতে যেতাম মনে হ'ল এই কাজগুলো আমাকে স্রষ্টার আরও কাছে নিয়ে যাচ্ছে। এটি আমাকে আরও আল্লাহতে বিশ্বাসী করলো। এভাবে টানা ৬ মাস ইসলামের মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয় অধ্যয়ন শেষে মনে হ'ল আমি মনস্তাত্ত্বিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সুবহানাল্লাহ! আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমি কালেমা পাঠ করে ইসলামের সৌন্দর্যে প্রবেশ করলাম। ইসলাম গ্রহণ করে আমি খুব খুশী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে এই সুন্দর পথে পরিচালিত করেছেন। করোনার জন্যে মসজিদে যেতে পারিনা এবং সবার সাথে সাক্ষাৎ হয়না, এটি আমাকে খুব কষ্ট দেয়। কিন্তু আল্লাহ চান তো এটি সাময়িক মাত্র।

আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি পরিবার এখনো জানেনা। তবে শীঘ্রই তাদেরকে জানাবো। আমার ইসলাম সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানা এবং চর্চার প্রয়োজন। তাহ'লে ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারব। কে জানে? একদিন তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে ইনশাআল্লাহ। রামাযান খুবই সন্নিকটে, পূর্বে কখনো ছিয়াম রাখিনি। জানিনা এটি কেমন কঠিন হবে। তারপরও ছিয়াম রাখা এবং সম্পূর্ণ কুরআন পড়ার চেষ্টা করবো।

মুনতাননা লোনে : মুনতাননা লোনে ২৫ বছর বয়সী একজন অস্ট্রেলিয়ান রাগবি প্লেয়ার। সে উইলিয়াম ওটসের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মূলতঃ ইসলাম একটি সুগন্ধির ন্যায়। যার ঘ্রাণ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তার কাছে ইসলামের আবেদন পৌঁছার বিষয়টি ছিল একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। যেমনটা কেউ প্রত্যাশাও করে না। সম্প্রতি মুনতাননা এবং উইলিয়াম ওটসের মধ্যে কথাবার্তার একটি স্ক্রিনশট ব্লগে পোস্ট করা হয়। যেখানে মুনতাননা তাকে ধন্যবাদ জানান। মূলতঃ ওটসের ইসলাম গ্রহণের ভিডিওটি দেখে সে ইসলামের পথে অনুপ্রাণিত হয় এবং ১৩ ই জুলাই ২০২০ সে ইসলাম গ্রহণ করে।

লোয়াজি সবু : লোয়াজি সবু দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। ইউটিউবে নিজের ভাব-ভঙ্গিমার বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করে তিনি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। হুট করে একদিন তাকে নিজের চ্যানেলে দু'টি ভিডিও আপলোড করতে দেখা যায়। যেখানে তিনি মুফতি ইসমাইল মেনক এবং ডা. জাকির নায়েকের ভিডিওতে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। খুব কম সংখ্যক দর্শকই তখন জানতেন তিনি মূলতঃ তাঁদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়েছেন। ১লা সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে লোয়াজি সবু তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তার আপলোডকৃত একটি ভিডিওতে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম মুহূর্ত কালেমা শাহাদাহ পাঠ করতে দেখা যায়।

দাউদ কীম পরিবার : দাউদ কীম একজন বিখ্যাত কোরিয়ান ইউটিউবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার রয়েছে ব্যাপক অনুসারী। সে ২০১৯ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। দাউদ তার ভক্তদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ, সুস্পষ্টভাষী এবং শান্ত শিষ্ট মানুষ হিসাবে পরিচিত। খুশীর সংবাদ হচ্ছে ১৬ই নভেম্বর ২০২০ সালে তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শাহাদাহ পাঠের একটি যৌথ ভিডিও আপলোড করেন। ভিডিওতে দেখা যায় দাউদ কীম শাহাদাহ পাঠ করার পর স্ত্রীও শাহাদাহ পাঠ করেন। ইউটিউব ক্যারিয়ারের পূর্বে দাউদ একজন পপ শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী 'আমি একটি অন্ধকার জগতে ছিলাম। অবশেষে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে শান্তির পরশ খুঁজে পেয়েছি'।

রেবেহা কোহা : রেবেহা কোহা একজন লাটভিয়ান ভার উত্তোলক ক্রীড়াবিদ। এটি হচ্ছে পেশী শক্তির খেলা। সে জুনিয়র ইভেন্টে দুইবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং একবারের ইউরো চ্যাম্পিয়ন। ২৬শে জুলাই ২০২০ সালে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। তার ইসলাম গ্রহণের এ বার্তাটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল

প্রিয় বন্ধু, অনুসারী ও সর্বসাধারণগণ!

আমি আমার জীবনে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সবাইকে বলতে চাই যে আমি এতে খুশী এবং কৃতজ্ঞ। আমি নিশ্চিত যে নিজের জন্যে সঠিক কাজটি করেছি। 'Today is special day for me, because I became a musilm'. 'আজ আমার জন্য অসাধারণ দিন। কারণ আমি মুসলিম হয়েছি'। ৩টা ৪৮ মিনিটে শাহাদাহ পাঠ করে আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি। এখন থেকে আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করছি। যেহেতু আমি এখন একজন মুসলিম, তাই সবাইকে বলতে চাচ্ছি যে, কেউ আমার সতর খোলা ছবি পোস্ট অথবা শেয়ার দিবেন না। যারা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ, সবার জন্য শুভকামনা এবং আল্লাহ সবাইকে মহিমান্বিত করুন।

একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন যে, আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্যে মূলত আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তার মাধ্যমে আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি। আমি অত্যন্ত খুশী এবং সত্য খুঁজে পাওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। উল্লেখ্য যে, রেবেকা কোহা গত মে মাসের শুরুতে কাতারের অধিবাসী মুয়াজ মুহাম্মাদের সাথে বাগদানের ঘোষণা দেন।

সিলভিয়া রোমানা : সিলভিয়া রোমানা পূর্বে বিখ্যাত কেউ ছিলেন না। রোমানা মূলত একজন ইতালিয়ান নারী। ইতালির একটি সাহায্য সংস্থার সাথে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে সে কেনিয়াতে অপহরণের শিকার হয়। সোমালিয়া ভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী আল-শাবাবের সদস্যরা ২০১৮ সালের নভেম্বরে তাকে অপহরণ করে।

৭ই মে ২০২০ সালে বিভিন্ন পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি নিউজ ছাপানো হয়। সেখানে বলা হয় ২৪ বছর বয়সী একজন ইতালিয়ানের সাহায্যে সে অপহরণের ১৮ মাস পর আফ্রিকায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। এ সংবাদে ইতালিয়ানরা আনন্দে উল্লোসিত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক দেশে আসার পর সম্পূর্ণ শরীর আবৃত হিজাব পরিহিত একজন নারীর বেশে তাকে দেখা গেল। প্রথম দেখাতেই সে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলো। সিলভিয়া ছিল খুবই খুশী। সে দাবী করল যে, তার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত একান্ত নিজের। কেউ তাকে জোর করেনি।

সিলভিয়া রোমানা ইতালীয় বার্তা সংস্থা এ. এন. এস. এ- কে যা বলেছেন, 'তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে আমাকে হত্যা করা হবে না এবং তা-ই হয়েছিল। আমি বন্দীদশার মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করি। এটি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং জোর করা হয়নি। বন্দীকালীন সময়ে তারা আমাকে একটি কুরআন দিয়েছিল এবং তাদের সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করেছিল। তাদের সাথে বৈবাহিক বা অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেখানে কেবল সম্মান ছিল।

ইয়ংস ওয়ার্ল্ড : ২০২০ সালের জানুয়ারীর ২ তারিখে বিখ্যাত কোরিয়ান ইউটিউবার ইয়ং তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেয়। তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সে ইসলাম নিয়ে পড়তে শুরু করে। ইয়ং বলছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি এটা ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। অন্যান্য প্রত্যাবর্তনকারীদের ন্যায় ইসলাম সম্পর্কে ইয়ংসের প্রাথমিক ধারণাটি ইতিবাচক ছিল না। যাই হোক আল্লাহ্‌র দয়ায় ইয়ং শেষ পর্যন্ত সত্য পথ খুঁজে পায়'।

ইলি কোয়ে : ইলি কোয়েন একজন প্রসিদ্ধ ইউটিউব ট্রাভেল ব্লগার এবং ভ্রমণ সংগঠক। তার একটি সক্রিয় ইউটিউব চ্যানেল আছে। সেখানে ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তিনি তাঁর মত নওমুসলিমদের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন, যাতে করে অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণের পথ দেখাতে পারেন।

রোজী গ্যাব্রিয়েল : রোজী গ্যাব্রিয়েল একজন কানাডিয়ান সলো ট্রাভেলার এবং ইউটিউবার। মটর সাইকেলে চড়ে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করার পর ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ২০২০ সালের ৯ই জানুয়ারী তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন তখন তিনি পাকিস্তান ও এর জনগণের দয়া ও মহানুভবতার প্রশংসা করেন। কেননা তিনি যে সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তা হ'তে মুক্ত করতে তারা তাকে সাহায্য করেছিল। তিনি মনে করেন প্রভুর প্রতি নিবেদন ও ধারণার কারণে তিনি অনেক আগ থেকেই একজন মুসলিম। তিনি বলেন, দুঃখজনকভাবে ইসলাম বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সমালোচিত ও ভুলভাবে ব্যাখ্যাকৃত ধর্ম। অথচ ইসলামের মূল কথা হ'ল **শান্তি, ভালাবাসা ও আল্লাহর একত্ব**। এটা কোন ধর্ম নয়, বরং জীবন চলার পথ। এটি একটি মানবতাপূর্ণ, ভালবাসাময় জীবন চলার পথ।

রুবি জেসি মিসো : টাইসন লেডি নামে সুপরিচিত রুবি জেসি মিসো ১৯শে নভেম্বর ২০২০ সালে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। সে একজন জনপ্রিয় বক্সিং তারকা। সে নেদারল্যান্ডে বেড়ে উঠেছেন এবং সেখানেই বাস করছেন। অবসর নেওয়ার পূর্বে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি একবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং একবার ইউরো চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। হিজাব পরিহিত অবস্থায় নেদারল্যান্ডের একটি মসজিদে তার ইসলাম গ্রহণের ছবিটি অনলাইন দুনিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়। ইসলামী বিশ্বের অধিবাসীরা তার এই সিদ্ধান্তে স্বাগত জানায়। তার একটি টুইট বার্তা থেকে জানা যায় যে তিনি বলেছেন, 'আমি খুব গর্বিত যে প্রায় এক বছর পড়াশোনা শেষে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। পূর্বে আমি ইসলামকে আত্মঘাতি মনে করলেও বর্তমানে আমি মসজিদে এসে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি খুব খুশী।

এইডেন লিকেলম্যান হেনরি : এইডেন হেনরি তিনি মূলত কম উচ্চতার জন্য লিকেলম্যান হিসাবে পরিচিত। তিনি তিন ফুট উচ্চতার একজন বিখ্যাত বক্সার। আজ থেকে ২৬ বছর পূর্বে তিনি ইংল্যাণ্ডের কভেন্ট্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র আকৃতির কারণে তিনি তার কাছের মানুষদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত এবং অবহেলার শিকার হয়েছিলেন। একটা সময় তিনি বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে জেলে যান। মার্চ ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন এবং পূর্বের জীবনের জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তার ভাষায়, 'আমি সংগ্রাম করে বেড়ে উঠেছি। যখন আপনি একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অর্ধেক আকারে জন্মগ্রহণ করবেন তখন আপনাকে কিছু পাওয়ার জন্য দ্বিগুণ সংগ্রাম করতে হবে।

আমি মাদক ও অপরাধের জগতে বেড়ে উঠেছি। আমি স্কুলে যাইনি, পড়তে পারিনি, আমার বাবা-মা নেই। আমার পিছনের ২৫টি বছর খারাপ কেটেছে। আমি দুঃখিত হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চাইছি। এখন আমার ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন হেনরি এবং তার বন্ধুরা শাহাদাহ পাঠ করেন এটি ছিল এক চমৎকার মুহূর্ত।

উপসংহার : ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। প্রত্যেকটা আদম সন্তান ইসলামী বিশ্বাসের উপর জন্মেছে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি দয়াশীল। দুনিয়ার মানুষ ভুলে গেলেও আমাদের রব কখনো আমাদের ভুলে যান না। বক্ষবান প্রতিবেদনে আল্লাহভোলা কিছু বান্দার নীড়ে ফেরার গল্প উপস্থাপিত হয়েছে। বান্দা যখন ইসলামে ফিরে আসে রহমতের দরিয়ার জোয়ার তখন নিমিষেই সকল পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। এক নিঃশ্বাসের কালিমা পঠনে সারাজীবনে পাপরাশি আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। মুহূর্তেই সাধিত হয় জীবনের এক আমূল পরিবর্তন। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন-আলহামদুলিল্লাহ।

[লেখক : শিক্ষার্থী, বিএসএস সম্মান, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা

-লিলবর আল-বারাদী

(২য় কিস্তি)

জ্ঞানার্জনকারীর মর্যাদা : আল্লাহ তা'আলাকে চেনার প্রথম স্তর হ'ল জ্ঞানার্জন করা। আল্লাহ্র নিকট থেকে যে অহির বিধান এসেছে তা হ'ল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মাজীদ ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ। এই দুই কিতাবের জ্ঞানকে দ্বীনী জ্ঞান বা ইলম বলা হয়। এই ইলম অর্জনকারী সম্পর্কে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্র সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল আল্লাহর বিধান জেনে বুঝে তাঁকে ভয় করেন। আল্লাহ্র তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহ্রকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*।

আর স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন নিজের প্রতি এবং অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন তারা, ফেরেশতা, যারা নিষ্ঠাবান জ্ঞানী। আল্লাহ্র তা'আলা বলেন, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও। তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*। এসম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেন। এতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের ফযীলত ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতাদের পাশাপাশি তাদেরকে উল্লেখ করেছেন। তবে জ্ঞানী বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করে ধন্য হয়েছেন' *(ফাতহুল ক্বাদীর)*।

কিতাব ও হিকমাত তথা অহীর জ্ঞানার্জনকারীর প্রতি আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন। তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার উপর রয়েছে আল্লাহ অপরিসীম অনুগ্রহ' *(নিসা ৪/১১৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'এভাবে আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমাদের নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথই *(শূরা ৪২/৫২)*? তিনি আরও বলেন, وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ 'তুমি আশা করতে না যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল তোমার পালনকর্তার রহমত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৬)*।

দুনিয়াতে মানবজাতি প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সর্বদা তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা। আর ইবাদতের পূর্বে ইলম অর্জন করা ফরয। অজ্ঞতা ও মূর্খতা পরিহার করে জ্ঞাতী সহকারে তাঁকে স্মরণ করা জন্যই সর্বপ্রথমে যে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন, সেই ইলম আহরণকারীই হ'ল সর্বোত্তম জ্ঞানী। যারা এমন জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত থাকে তাদের মর্যাদা নিম্নরূপ-

১. জ্ঞান অন্বেষণকারীর চলা পথে ফেরেশতা ডানা বিছিয়ে দেন : জ্ঞান অন্বেষণকারী যখন ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে, তখন সে যেন জান্নাতের পথেই থাকে এবং ফেরেশতাগণ তার চলার পথে ডানা বিছিয়ে দেন। আবূ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন'।[১] অন্যত্র এসেছে, ছফওয়ান ইবনু আসসাল আল-মুরাদী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয়, তার এই সন্তে

১. *আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামি' হা/৬২৯৭।*

ষজনক উদ্যোগে প্রীত হয়ে ফেরেশতামণ্ডলী তার চলার পথে তাদের পাখা বিছিয়ে দেন'।[২]

২. স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল করা হয় : আল্লাহ তা'আলা ইলম অর্জনকারী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর তরফ থেকে স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাকে রহমত দ্বারা ঢেকে দেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহ কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল হ'তে থাকে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না'।[৩]

৩. আসমান ও যমীনবাসীর দো'আ প্রযোজ্য হয় : জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আসমান-যমীনের সকল প্রাণী ও বস্তু দো'আ করেন। আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ. 'নিশ্চয়ই যারা আলেম তাদের জন্য আসমান ও যমীনে যারা আছে, তারা আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি পানির মধ্যকার মাছ সমূহও'।[৪] অন্যত্র এসেছে, আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. 'আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আকাশমন্ডলী ও যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত ইলম অর্জনকারীর জন্য দো'আ করে'।[৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ على مُعَلِّمِ الخَيْرِ حَتَّى حِيْتَانِ الْبَحْرِ 'মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্তও দো'আ করে'।[৬]

৪. জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ : ইলম অর্জনকারী কুরআনের প্রতিটি বর্ণ পাঠের বিনিময়ে নেকী পাবে। আর সে নেকী আমলের দশগুণ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে নেকী পাবে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশ গুণ। আমি বলছি না, 'আলিফ লাম মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ', 'লাম' ও 'মীম' এক একটি আলাদা অক্ষর'।[৭]

কুরআন পাঠকারী ক্বিয়ামতের দিনে যত বেশী পাঠ করতে পারবে, সে তত বেশী জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌঁছাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا. 'কুরআন পাঠকারীকে ক্বিয়ামতের দিন বলা হবে, তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। সুস্পষ্টভাবে ঠিক সেইভাবে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে তিলাওয়াত করতে। কারণ তোমার মর্যাদার স্থান ততখানি উঁচু হবে, যেখানে তুমি তিলাওয়াতের আয়াত শেষ করবে'।[৮]

কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ. 'কুরআন অধ্যয়নে পারদর্শী ব্যক্তি মর্যাদাবান লিপিকার ফেরেশতাগণের সাথী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে ও আটকে যায় এবং কুরআন তার জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহ'লে তার জন্য দু'টি পুরস্কার'।[৯]

জ্ঞান সর্বদা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। সমাজে সুশীলতা বিরাজ করবে। দলে দলে মানুষ জ্ঞানের উপকার ভোগ করবে। আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

---

২. ইবনু *মাজাহ হা/২২৬; দারাকুৎনী হা/৭৭৬; ছহীহুল জামি' হা/৫৭০২; ছহীহ হাদীছ।*
৩. *মুসলিম হা/২৬৯৯;; ইবনু মাজাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২০৪।*
৪. *আবূ দাউদ হা/৩৬৪১; হাসান হাদীছ মিশকাত হা/২১২।*
৫. *তিরমিযী হা/২৬৮৫; দারেমী হা/২৮৯; ছহীহুল জামি' হা/৪২১৩ মিশকাত হা/২১৩।*
৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৫২।*
৭. *তিরমিযী হা/২৯১০;; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২৭; হাসান ছহীহ মিশকাত হা/২১৩৭।*
৮. *তিরমিযী হা/২৯১৪;; আবূ দাউদ হা/১৪৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৪০; ছহীহুল জামি' হা/৮১২২; হাসান ছহীহ মিশকাত হা/২১৩৪।*
৯. *মুসলিম হা/৭৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৭৯; মিশকাত হা/২১১২।*

كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىإِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ وَزَرْعُوا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِى دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً مَاءً وَلَمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا فَعَلِمَ وَعَلَّمَ بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ. ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হ’ল যমীনে মুষলধারে বৃষ্টি, যা কোন ভূখণ্ডে পড়েছে। সে ভূখণ্ডের একাংশ উৎকৃষ্ট, যা বৃষ্টিকে চুষে নিয়েছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি ও ঘাস জন্ম দিয়েছে। আর অপর অংশ ছিল কঠিন ও গভীর, যা পানি শোষণ না করে আটকিয়ে রেখেছে। যার দ্বারা মানুষেরা উপকৃত হয়েছে। লোকেরা তা পান করেছে, অপরকে পান করিয়েছে এবং ক্ষেত-খামারে কৃষি ও সেচকার্যও করেছে। অপরদিকে কিছু বৃষ্টি ভূমির সমতল ও কঠিন জায়গায় পড়েছে, যা পানি আটকিয়ে রাখেনি, শোষণ করেনি কিংবা গাছপালাও জন্মায়নি। এটা হ’ল সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে এবং যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন এটা তার কল্যাণ সাধন করেছে। সে তা শিক্ষা করেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে। আর অপর উদাহরণ হ’ল, যে ব্যক্তি এর দিকে মাথা তুলে দেখেনি এবং আল্লাহ তা‘আলার যে হেদায়াতবাণী দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা সে কবুলও করেনি’।[১০]

৫. সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে ঘোষিত : মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম যে নিজে কুরআনের ইলম শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. ‘তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দেয়’।[১১]

ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে বেশী। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছাহাবীরা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, أَتْقَاهُمْ ‘তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক মুত্তাক্বী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, فَيُوسُفُ نَبِىُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِىِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِىِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . ‘তাহ’লে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নবী’র পুত্র, আল্লাহর নবী’র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا . ‘তাহ’লে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন’।[১২]

৬. ইলম অর্জনকারী নবীর ওয়ারিছ : জ্ঞান অন্বেষণকারীগণ যখন জ্ঞানার্জনের পর নিজের জীবনে তা প্রতিপালন করে বা সে অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা আলিম হিসাবে পরিগণিত হয়। আর এসব আলিম বা জ্ঞানীরাই নবীর প্রকৃত ওয়ারিছ। আবু দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. ‘আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের উপরে ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের উপরে যেরূপ। নিশ্চয়ই আলেমগণ হ’লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না। বরং তারা রেখে যান কেবল ইলম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে’।[১৩]

৭. সাধারণ আবিদ ব্যক্তির চেয়ে আলিমগণ মর্যাদাবান : আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হ’ল। তাদের একজন আবিদ বা ইবাদাতকারী, আর অপরজন আলিম বা দ্বীনের জ্ঞানার্থী ছিলেন। তিনি বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ. ‘আলিমের মর্যাদা আবিদের ওপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের ওপর’।[১৪]

ক্বাযী আয়ায বলেন, নক্ষত্রের আলো দ্বারা সে কেবল নিজেই আলোকিত হয়। কিন্তু চাঁদের আলো নিজেকে ছাড়াও অন্যকে আলোকিত করে। অনুরূপভাবে একজন আবিদ ব্যক্তি তার ইবাদত দ্বারা কেবল নিজের আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি ঘটায়। কিন্তু একজন আলিম ব্যক্তি তার ইলম দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হন, তেমনি অন্যকেও উপকৃত করে থাকেন। আর একজন আলিম উক্ত নূর লাভ করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে। যেমন চন্দ্র জ্যোতি লাভ করে থাকে সূর্য থেকে। আর

১০. বুখারী হা/৭৯; মুসলিম হা/২২৮২; ইবনু হিব্বান হা/৪; মিশকাত হা/১৫০।
১১. বুখারী হা/৫০২৭; আবূ দাঊদ হা/১৪৫২; তিরমিযী হা/২৯০৭; মিশকাত হা/২১০৯।
১২. বুখারী হা/৩৩৫৩, ৩৩৮৩; মুসলিম হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/২০১; ।
১৩. আবূ দাঊদ হা/৩৬৪১; হাসান হাদীছ মিশকাত হা/২১২; ।
১৪. তিরমিযী হা/২৬৮৫; দারেমী হা/২৮৯; ছহীহুল জামিদ হা/৪২১৩; মিশকাত হা/২১৩; ।

সূর্য কিরণ লাভ করে মহান আল্লাহ্র রব্বুল আলামীন থেকে *(মিরক্বাত)*। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহি লাভ করে থাকেন আল্লাহ্র সুবহানাহু ওয়া তা'আলার থেকে। তাই রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَصْدٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ 'অধিক ইবাদত করার চেয়ে অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম'।[১৫]

৮. জিহাদের ছওয়াব অর্জন : জিহাদের ছওয়াব হাছিল করার অন্যতম মাধ্যম হ'ল দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ، 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় আছে বলে গণ্য হবে'।[১৬]

ইলম অর্জনকারীর সম্মান আল্লাহ্র পথে জিহাদরত সৈনিকের মত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ 'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে জ্ঞান শেখার জন্য অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করে, তার মর্যাদা আল্লাহ্র পথে জিহাদরত সৈনিকের মত। আর যে ব্যক্তি ভিন্ন উদ্দেশ্যে এখানে আসে, তার উপমা সেই ব্যক্তির মত, যে অপরের সম্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে'।[১৭]

৯. হজ্জের ছওয়াব অর্জন : ইলম অজর্নের জন্য মসজিদে গমন করলে, তার আমলনামায় পূর্ণ হজ্জের ছওয়াব হয়। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ 'যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক দ্বীন শেখা বা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, তার জন্য পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়'।[১৮]

১০. চেহারায় চির উজ্জ্বলতা লাভ : ইলম অর্জনের ফলে জ্ঞানীর চেহারা চির উজ্জ্বলতার বহিঃপ্রকাশ থাকবে। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ. 'যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীছ শুনে ও তা মুখস্থ রাখে এবং অন্যের নিকটে তা পৌঁছে দেয়, আল্লাহ তাকে চির উজ্জ্বল করে রাখবেন। জ্ঞানের বাহক, তার চেয়ে অধিক বুঝদার লোকের নিকট তা বহন করে; যদিও জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়'।[১৯]

কুরআন দ্বারা হেদায়াত কেবল তারাই পায়, যাদের মধ্যে ঈমানের অনুসন্ধান ও তার প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকে। তারা এটাকে হেদায়াত লাভের নিয়তে পড়ে, শোনে এবং চিন্তা-গবেষণা করে। তাই আল্লাহ এদের সাহায্য করেন এবং হেদায়াতের পথ সুগম করে দেন। এই পথের উপরেই এরা অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যারা নিজের চোখ বন্ধ করে নেয় ও কানে ছিপি লাগিয়ে নেয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, তারা হেদায়াত কিভাবে পেতে পারে? আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيْدٍ 'বল, বিশ্বাসীদের জন্য এটা পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হ'তে আহ্বান করা হয়' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৪)*।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৭; সনদ ছহীহ।

১৬. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৮; সনদ হাসান লিগায়রিহী (আলবানী); রিয়াযুছ ছলেহীন হা/১৩৯৩; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান।

১৭. ইবনু মাজাহ হা/২২৭; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৪; সনদ ছহীহ।

১৮. ত্বাবারানী হা/৭৩৪৬; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৬; হাসান ছহীহ।

১৯. আহমাদ হা/২৮৬৪; আবুদাঊদ হা/৩৬৬০; তিরমিযী হা/২৬৫৬; সনদ ছহীহ।

ইহূদী ঘরে জন্মানো এক খ্রিস্টান ভাষাবিদ লেইটনার এবং ব্রিটেনের শাহজাহান মসজিদ

-জান্নাতুন নাঈম পায়েল

এই গল্পের মুখ্য চরিত্র এক বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। নাম তার গটলিয়েব উইলহেম লেইটনার। জন্ম ১৮৪০ সালের ১৪ অক্টোবর, পেস্টে। যেটি বর্তমানে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের অংশ। চাইল্ড প্রডিজি ছিলেন লেইটনার। ১৮৫০ সালে, বয়স দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছানোর আগেই, বেশ কিছু ইউরোপীয় ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে ফেলেন তিনি। তাই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কনস্ট্যান্টিপোলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল)এ তুর্কী ও আরবী ভাষা শিখতে। আর বয়স ১৫ অতিক্রমের আগেই ক্রিমিয়ায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে দোভাষীর কাজ আরম্ভ করে দেন তিনি।

লেইটনারের ভাষাজ্ঞান যেমন ছিল অবিশ্বাস্য (মোট ১৫টি ভাষা নখদর্পণে ছিল)এ তার ধর্মীয় ইতিহাসও কিন্তু কম চমকপ্রদ নয়। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন একজন ইহুদী, কেননা তার পরিবার ছিল ঐ ধর্মের। সৎ বাবার কাছ থেকে খ্রিষ্টীয় পরিচয়ও পেয়েছিলেন তিনি এবং শৈশবে বেড়েও উঠেছিলেন একজন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান হিসাবে। অথচ সারাটা জীবন জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষকতার পাশাপাশি আরেকটি কাজ করে গেছেন তিনি। সেটি হ'ল ইসলামের প্রচার। শুনতে অবাক লাগার মত। কিন্তু সত্যিই তাই। তিনি একজন ইহুদী, পরিচয়ে খ্রিস্টান; আবার অনন্য অবদান রেখেছেন ইসলাম প্রচারে!

কীভাবে জন্মাল ইসলামের প্রতি লেইটনারের এত টান? এক্ষেত্রে কনস্ট্যান্টিপোলে গিয়ে তুর্কী ও আরবী ভাষা শিক্ষা, তারপর বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভ্রমণের একটা প্রভাব তো ছিলই। কথিত আছে, মুসলিম দেশসমূহে ভ্রমণকালে নাকি তিনি একটি মুসলিম নামও গ্রহণ করতেন। আর তা হ'ল আব্দুর রশীদ সায়াহ (সাইয়াহ অর্থ ভ্রমণকারী)। তাছাড়া বয়স যখন সদ্য বিশের কোঠায়, তখনই লন্ডনের কিংস কলেজে আরবী ভাষার অধ্যাপক বনে যান লেইটনার। সেখান থেকে তাঁর পরবর্তী গন্তব্য হয় ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ। বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে একটি গণশিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা কিংবা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে যুক্ত হন তিনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের নীতি-নির্ধারণী বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন এবং উর্দূ ভাষায় ইসলামের ইতিহাস নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন।

তবে সবকিছুর পাশাপাশি, লেইটনার আকৃষ্ট হন আরেকটি বিষয়েও। আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার একটি সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে। ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন লেইটনার। লক্ষ্য স্থির করেন, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। তাই তিনি পরিকল্পনা করেন, এমন একটি জ্ঞানকেন্দ্র গড়ে তুলবেন, যেখানে প্রাচ্যদেশীয় ভাষা ও ইতিহাস নিয়ে চর্চা করা হবে। খুঁজতে খুঁজতে সারের ওকিংয়ে একটি মন মত জায়গা পেয়ে যান তিনি। ১৮৬২ সালে ওকিং রেললাইনের পাশে নিও-গথিক শৈলীর একটি লাল ইটের দালান তৈরী করা হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতাদের জন্য। কিন্তু অনেক বছর ধরেই খালি পড়ে ছিল সেটি। তাই লেইটনার সেটিকে রূপান্তরিত করেন তার স্বপ্নের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে। দ্রুতই প্রতিষ্ঠানটি দারুণ সুনাম অর্জন করে বৃত্তি ব্যবস্থার কারণে। তাছাড়া এখান থেকে আরবী, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় জার্নাল প্রকাশিত হ'তে থাকে এবং ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এসে ভর্তি হয় এই প্রতিষ্ঠানে।

১৮৯৯ সালের ২২শে মার্চ লেইটনারের মৃত্যুর পর অবশ্য প্রতিষ্ঠানটি বেশীদিন টেকেনি। তহবিল ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সময় সেটি রূপান্তরিত হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে এবং শত বছর পর সেখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রিটেইল স্টোর।

তবে যেটি এখনো টিকে রয়েছে, তা হ'ল লেইটনারের প্রতিষ্ঠিত ব্রিটেনে নির্মিত হওয়া প্রথম মসজিদ- শাহজাহান মসজিদ। ১৮৮৯ সালে নির্মিত হয় মসজিদটি, যেন ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের মুসলিম শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সেখানে ছালাত আদায় করতে পারেন। অবশ্য লেইটনারের পরিকল্পনা ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি চেয়েছিলেন, তার আন্তঃধর্মীয় সংযোগ স্থাপনের অংশ হিসাবে মসজিদের পাশাপাশি একই জায়গায় খ্রিস্টানদের গীর্জা এবং হিন্দু ও ইহুদীদের মন্দিরও গড়ে তুলবেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে কেবল মসজিদের কাজই সম্পন্ন করে যেতে পেরেছিলেন তিনি।

যা-ই হোক, ওকিংয়ে শাহজাহান মসজিদ নির্মাণের আগেই ১৮৮৭ সালে লিভারপুলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন আব্দুল্লাহ কুইলিয়াম। তারপরও একদিক থেকে শাহজাহান মসজিদ এগিয়ে। কেননা শাহজাহান মসজিদই হ'ল ব্রিটেনের প্রথম মসজিদ, যেটির দালান শুরু থেকেই মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে নির্মিত হয়। অন্যদিকে লিভারপুলে মূলত ইতোমধ্যে বিদ্যমান একটি ভবনকে মসজিদে রূপ দিয়েছিলেন কুইলিয়াম।

শাহজাহান মসজিদের পরিকল্পনা করেন গিল্ডফোর্ডের এক খ্রিস্টান প্রকৌশলী, উইলিয়াম আইজ্যাক চেম্বার্স। মসজিদের ঘনাকৃতির খিলানের বহির্ভাগ অনেকটা ভারতীয় মুঘল শৈলী থেকে অনুপ্রাণিত। সাদা দেয়ালের উপর গম্বুজটা সবুজ। সব মিলিয়ে ব্রিটেনের প্রাক-বিংশ শতকের স্থাপত্যশৈলী হিসাবে মসজিদটির নকশা খুবই উঁচুদরের।

মসজিদটি নির্মাণের জন্য লেইটনার অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন ভারতের ভূপাল রাজ্যের শাসক এবং সুলতানা শাহজাহান বেগম (১৮৩৮-১৯০১খ্রি.)-এর কাছ থেকে (যিনি ছিলেন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভুপালী (১৮৩২-১৮৯০খ্রি.)-এর স্ত্রী) এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন মসজিদটির নাম শাহজাহান মসজিদ!

১৮৯৯ সালে লেইটনারের মৃত্যুর পর শাহজাহান মসজিদের পরিণতিও প্রায় ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের মত হ'তে বসেছিল। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট উঠে যাওয়ায় এই মসজিদে ছালাত আদায়ের মত যথেষ্ট লোকও ছিল না। অব্যবহারে, অনাদরে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল মসজিদটি। তাই লেইটনারের ছেলে তো মসজিদটি বিক্রিই করে দিতে যাচ্ছিলেন।

শেষ রক্ষা হয় ১৯১৩ সালে পাঞ্জাব থেকে ব্রিটেনে আসা ভারতীয় আইনজীবী ও পণ্ডিত খাজা কামালুদ্দীনের বদৌলতে। তার কারণেই যেন অনেকটা নবজীবন লাভ করে এই 'অমুসলিম দেশের মসজিদ'। তৎকালীন প্রভাবশালী নাইট লর্ড হেডলিকে তিনি রাযী করান মসজিদটি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করতে। তাই সে যাত্রায় বেঁচে যায় মসজিদটি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অনেকটা ধুঁকে ধুঁকে চললেও এর কয়েক বছর পর স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে অভিবাসীরা এসে ব্রিটেনে বসতি গড়ে তুললে মসজিদটিরও প্রকৃত সদ্ব্যবহার শুরু হয়।

শাহজাহান মসজিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম গোরস্থানের নামও। সেটি হলো 'দ্য মোহামেডান সিমেট্রি'। ১৮৮৪ সালে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি এটিও তৈরী করেন লেইটনার। মূলত ব্রুকউড সিমেট্রির (তৎকালীন ইউরোপের বৃহত্তম গোরস্থান এবং এখনো যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম) একটি প্লট আলাদা করে রাখা হয় মুসলিমদের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু সেখানে প্রথম দাফনকার্য সম্পন্ন হয় ১৮৯৫ সালে, যখন লন্ডন সফরকালে মৃত্যুবরণ করেন শেখ নুবি নামের এক ভারতীয় জাদুকর।

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মাঝে, শাহজাহান মসজিদের তৎকালীন ইমাম মৌলভী ছদরউদ্দীন আরেকটি গোরস্থানের জমি আদায় করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। এই গোরস্থানটি ছিল নির্দিষ্টভাবে কেবল যুদ্ধে শহীদ হওয়া মুসলিম সৈন্যদের জন্য। হরসেল কমনে অবস্থিত, ওকিং মুসলিম ওয়ার সিমেট্রি নামে পরিচিত গোরস্থানটিকেও সাজানো হয় মুঘল শৈলীতে, শাহজাহান মসজিদের সাথে মিল রেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেখানে মোট ১৮ জনকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফ্রি ফ্রেঞ্চ বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করে নিহত হওয়া মুসলিম সৈন্যদেরও এখানেই দাফন করা হয়।

১৯৬৯ সালে কবরগুলোকে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ব্রুকউড মিলিটারি সিমেট্রিতে স্থানান্তর করা হয় এবং ২০১৫ সালে জায়গাটি পুনরায় নামাঙ্কিত করা হয় 'মুসলিম ওয়ার সিমেট্রি পিস গার্ডেন' হিসাবে।

শাহজাহান মসজিদ এবং গোরস্থানগুলো সবই এখন ব্রিটেন'স মুসলিম হেরিটেজ ট্রেইলসের অংশ, যার মাধ্যমে দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে দেখতে ও জানতে পারে ব্রিটেনে মুসলিম বসতি ও সভ্যতার ইতিহাস। বিশেষত ব্রিটেনের অভিবাসী মুসলিমদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ নিজেদের শিকড় সন্ধানের জন্য।

(ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

বিচক্ষণ বিচারক

-অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্যক্তি একজনকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ধার দিয়েছিল। কিন্তু কোন চুক্তিপত্রে লিখেনি। যখন সে টাকা ফেরত চায় তখন ঋণগ্রহীতা অস্বীকার করে বলে, কিসের টাকা? কোন বইয়ে লেখা আছে? নিরুপায় হয়ে পাওনাদার বিচারকের কাছে অভিযোগ করে। বিচারক ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করে বলেন, এই লোকের কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছ তা দিচ্ছ না কেন?

ঋণগ্রহীতা : আমি কোন টাকা নেইনি। সে মিথ্যা কথা বলছে। সে আমার সম্মান নষ্ট করতে চায়। বিচারক এদের দু'জনের বিচারের জন্য তার ঊর্ধ্বতন বিচারকের কাছে পাঠান।

বিচারক : তোমাদের অভিযোগ বল। একজন তার পাওনা টাকার কথা বলল, আর অন্যজন তা অস্বীকার করল।

একজন পাওনাদার আর অন্যজন অস্বীকারকারী। শরী'আতের আদেশমতে পাওনাদারের অবশ্যই সাক্ষী থাকতে হবে আর যে অস্বীকার করবে তাকে কসম করতে হবে। অতঃপর পাওনাদারকে বলল, তোমার কোনো সাক্ষী আছে, যে বলবে এই লোক টাকা নিয়েছে? পাওনাদার বলল, না, সাক্ষী নেই।

বিচারক : তাহ'লে কোন উপায় নেই। অবশ্যই অভিযুক্ত কসম করুক। যদি কসম করে বলে টাকা নিইনি তাহ'লে আর কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু অপরাধীরা আল্লাহকে ভয় পায় এবং মিথ্যা কসম করে না। কারণ একদিন সত্য ফাঁস হলে অপমান ও শাস্তির বোঝা তাকে বইতে হবে।

পাওনাদার : এ কথা শুনে কান্নাকাটি শুরু করে। অনুনয় বিনুনয় করে বিচারককে বলে, এই কাজ করবেন না। এই লোকের কসমের প্রতি কোন বিশ্বাস নেই। সে মিথ্যা কসম করবে এতে আমার অধিকার পদদলিত হবে। অন্য উপায় বের করে একটি সমাধান করুন।

বিচারক : তুমি বলছো তোমার কোন সাক্ষী নেই আর আমিও তো গায়েব জানি না। তাহ'লে টাকা ধার দেওয়ার ঘটনাটা তার সামনেই বলো দেখি, সত্য ঘটনা বের হয় কিনা।

পাওনাদার : ঘটনা হ'ল আমরা কয়েক বছর ধরে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। আমি তার মধ্যে কোন অসৎ কাজ দেখিনি এবং সে প্রচণ্ড গরীবও ছিল না। বাগান, বাড়ি ও জমানো পুঁজি ছিল। হঠাৎ বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে সেখানে যায়। ঐ সময় এক সপ্তাহ পরে বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হয়। মেয়েটির আরো বিবাহের প্রস্তাব ছিল। ঐ দিনগুলোতে আমার বন্ধু প্রেমাসক্ত, অস্থির ও চিন্তায় পড়ে থাকত। আমরা একদিন এক বনে ঘুরতে যাই। আমরা দু'জনই এক জায়গায় বসে ছিলাম। সে আমাকে তার অবস্থা খুলে বলে। আমার কাছে নগদ টাকা নেই। এক টুকরা জমি যেটা গ্রামে আছে সেটা বিক্রি করে বিবাহের খরচ জোগাড় করবো। কিন্তু সময় নেই। আমি এই কথাগুলো শুনে চিন্তায় পড়লাম। তার জন্য আমার কষ্ট লাগলো। দুনিয়ার সম্পদ বলতে আমার সেই ১০০ স্বর্ণমুদ্রা। কি বলছি আমি তা না ভেবেই তাকে বললাম, হে বন্ধু! আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার কাছে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা আছে। কিন্তু সেটাই আমার একমাত্র সম্বল। যদি তা তোমাকে ধার দিই তাহ'লে কতদিন পর ফেরত দিবে? সে বললো, এক মাস। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ও দো'আ করে কথা দিল এক মাসের মধ্যে ঐ জমি বিক্রি করে টাকা ফেরত দিবে। আমি তাকে ঐ নগদ টাকা দিলাম আর সে তার কাজ করলো। এক মাস, দু'মাস, এক বছর, দু'বছর চলে গেল। আমি আমার কাজ করতাম। টাকার ব্যাপারে কোন কথায় বলতাম না। সেও কোন কথা বলতো না। আমি খেয়াল করলাম তার কাছে তখনও কোন টাকা ছিল না।

এক সপ্তাহ পূর্বে সে ঐ জমিটা ভালো দামে বিক্রয় করেছে। আমি জানতাম তার কাছে নগদ টাকা রয়েছে। একদিন আমি তাকে ঐ ১০০ স্বর্ণ মুদ্রার কথা বললাম। আর সে অন্য কথা বলে কাটিয়ে দিল। আমার সন্দেহ হ'ল। আমি পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলতেই সে অস্বীকার করে বললো, কিসের হিসাব, কোথায় লেখা আছে, কিসের টাকা? যখন দেখলাম, তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করাটা আমার ভুল ছিল। নিরুপায় হয়ে বিচারকের কাছে অভিযোগ করলাম। এটাই আমাদের গল্প ছিল।

বিচারক : যেদিন তাকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলে সেদিন কোথায় বসে ছিলে? বলল, আমরা এক গাছের নিচে বসেছিলাম। সেখানে নদীভরা পানি আর জায়গাটা খুবই মনোরম ছিল। এ পর্যন্ত বলার পর বিচারক আসামীকে বললেন, এই ঘটনা সত্য? সে বললো, পুরোটাই মিথ্যা।

বিচারক : পাওনাদার, তুমি যখন বলছো গাছের নীচে বসে টাকা দিয়েছিলে। তাহ'লে কেন বলছো সাক্ষী নেই? ঐ গাছটাই তো সাক্ষ্য দিবে। সে বললো, গাছ কিভাবে সাক্ষ্য দিবে? আমি যেভাবে বলছি। এখানে আমি আসামীকে আটক রাখছি। তুমি এখন ঐ গাছের কাছে যাও, তাকে আমার সালাম দাও এবং বল, বিচারক বলেছে এখানে এসে সাক্ষ্য প্রদান করতে। এই সময় আসামী কথাগুলো শুনে উপহাস মনে করে মুচকি হাসে। বিচারকও তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

পাওনাদার : আমি গাছকে এ কথা বললে, গাছ বিশ্বাস করবে কি না সে ভয় পাচ্ছি।

বিচারক : এসো আমার নাম লেখা এই সীলমোহর নাও এবং গাছকে দেখিয়ে বল, চল আমার সাথে। বাদী বিচারকের সীলমোহর নিয়ে গাছের কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হ'ল। বাদী বের হয়ে গেলে, কাজী বই পড়া শুরু করলেন। অতঃপর নরম স্বরে আসামীর সাথে কথা বলা শুরু করলেন।

বিচারক : বাযারের পরিস্থিতি ভালো নয়। ঐ লোকটি বললো, হ্যাঁ, কাজ-কর্মে মন্দা চলছে। মানুষের ঝগড়া করারও মেজাজ নাই। আমরাও প্রায়শই বেকার বসে থাকি, বই পড়ি। আসলে বিচারক বলতে চাচ্ছেন আমাদের কাজেও মন্দা। আসামীও সে জায়গায় কিছু কথা বলল। বিচারকের কথা বলা দেখে মনে মনে ভাবল, বিচারক হয়ত ঘুষ নিয়ে তাকে কসম করিয়ে বিচার করে দিবে। সে ভাবল, বিচারক বোধহয় বাদীর সাথে উপহাস করেছে। আস্তে আস্তে তার ভয় ভেঙ্গে যায়।

বিচারক আরো কয়েক পৃষ্ঠা বই পড়ে ফিসফিস করে বললেন, '(এই বিচারের) মানসিকতাই নষ্ট হয়ে গেল। এই লোকটা গেল আর আসল না। আমার মনে হয় স্থানটি অনেক দূর। তাই সে নিরুপায় হয়ে রাগ করে চলে গেছে। তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বন্ধু কি এতক্ষণে ঐ গাছের কাছে পৌঁছে গেছে? তোমার কি মনে হয়?

ঋণগ্রহীতা : লোকটি দ্রুত জবাব দেয়- এখনো না, জনাব।

বিচারক কোন জবাব না দিয়ে বই পড়তে ব্যস্ত হয়ে যান।

পাওনাদার : ঘণ্টা খানিক পরে বাদী মন খারাপ করে ফিরে এসে বলে, 'হুজুর, গিয়েছিলাম, আপনার সালাম দিলাম, আপনার সীলমোহর দেখালাম, আপনার কথাও গাছকে বললাম। কিন্তু গাছ কোন উত্তরই দিল না। আমি যতই ধৈর্য ধরে বসে ছিলাম, সে তার জায়গা থেকে নড়লো না। আমি ফিরে আসলাম। এই নিন আপনার সীলমোহর, এখন কি করা উচিত?'

বিচারক : এইমাত্র গাছ এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে গেল। তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে অত্যাচারী, নিজের বন্ধুর কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিলে তা দিয়ে দাও নতুবা আমি হুকুম দিয়ে তোমাকে হাকীমের (প্রধান বিচারক) কাছে পাঠাবো। কীভাবে টাকা আদায় করতে হয়, তিনি ভালোই জানেন।

ঋণগ্রহীতা : হে বিচারক! কেন অবিচার করছেন? আমি এখানেই আছি। কই গাছ এসে তো সাক্ষী দিল না!

বিচারক : যখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম ওমুক লোক গাছের কাছে পৌঁছেছে? তুমি বললে, এখনো না। তুমি নিজেই বাদীর সাক্ষ্য দিয়েছ। যদি কোন টাকা, ঐ গাছ বা সাক্ষীর ব্যাপার না থাকত। তাহ'লে তুমি বলতে কোন গাছ? জানি না বাদী কোথায় গেছে? কিন্তু তুমি বলেছিলে, বাদীর সব কথাই মিথ্যা। তাহ'লে কীভাবে গাছ চিনলে?'

বিচারকের বিচক্ষণতায় আসামী দোষী প্রমাণিত হ'ল। আসামী লজ্জিত হ'ল। নিরুপায় হয়েই বিচারকের কথা মেনে নিল এবং অবশেষে ধারের টাকা পরিশোধ করল।

শিক্ষা :

(১) আমাদের জীবন চলার পথে বন্ধুত্ব নামক আত্মিক, বিশ্বাসী ও মযবুত বন্ধন তৈরী হয়। এ বন্ধন আস্থা, ভরসা, পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন। যদি সেখানে মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা লাগে তাহ'লে কাঁচের পাত্রের মত সে বন্ধন নিমিষেই ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়। সৎ বন্ধু যেমন আমাদের হক্ব পথে চলতে শেখায়, তদ্রূপ সুবিধাভোগী, অসৎ বন্ধু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বলটা কৌশলে হাতিয়ে নিয়ে সীমাহীন ক্ষতি সাধন করে বসে। কথায় আছে 'অর্থই অনর্থের মূল'। কিন্তু অর্থের লেনদেনই অনেকাংশে প্রকৃত বন্ধু চিনতে সাহায্য করে। সেজন্য বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

(২) একজন বিচারককে গ্রন্থগত বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি উপস্থিত বুদ্ধির দক্ষতাও অর্জন করতে হয়। এতে অনেক বিচারকার্যে সেই দক্ষতার ব্যবহার মযলুমকে তার প্রকৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে।

(৩) এই গল্পটি ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেত্রের মালিকের বিরোধ মীমাংসায় কুরআনে বর্ণিত হযরত দাউদ (আঃ) এবং তদীয় পুত্র হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ন্যায়বিচারের বিচক্ষণতার কথা স্বরণ করিয়ে দেয় *(নবীদের কাহিনী ২য় খন্ড ১৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*। *(গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত)*

[অনুবাদক : এম.এ (অধ্যায়নরত) ফারসী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আত্মসমর্পণ

-নিশাত তাসনীম
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

[১]

পড়ন্ত বিকেল। সমস্ত পশ্চিম আকাশটা জুড়ে লালের সমারোহ। সেই লাল ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে, পুকুরে ও গাছপালায়। সময়টা জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি। তখনও আমি হিন্দু ছিলাম, মুসলিম হইনি। ধার্মিক হিন্দু নয়, বলতে গেলে নামেমাত্র হিন্দু। তখন পূজা মানেই আমার কাছে আনন্দ-ফূর্তি ছিল। তবে মা বলতো, ছোটবেলায় আমি কৃষ্ণের অনেক ভক্ত ছিলাম। এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই।

আমি একটা টিভি চ্যানেলে চাকুরী করি। উপর ধাপের কর্মকর্তা। মিডিয়ার সাথে অনেক আগেই জড়িয়েছি। শুটিং, আনন্দ-ফূর্তি, মৌজ-মাস্তি ছিল নিত্য দিনের রুটিন। স্রষ্টাকে কখনও খোঁজার চেষ্টা করিনি। তবে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ছিলাম। মুসলিমদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরায় খুবই বিরক্ত বোধ করতাম। সেইবার চ্যানেলে এক ভাইয়ের চাকুরী হয়। তার নাম মুনীর। ধর্মীয় পরিচয়ে সে ছিল মুসলিম। চরম মুসলিম বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও মুনীর ভাইয়ের সাথে আমার ভালো একটা সম্পর্ক তৈরী হয়। মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমার সেরকম জানা ছিল না। সত্যি বলতে আমি কোন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষা পাইনি। বাবা মা হিন্দু, তাই আমিও হিন্দু। মুসলিম শিশুরা যেমন ছোটবেলায় মক্তবে যায়, হিন্দু ধর্মে সেরকম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে মুনীর ভাই তার ধর্মের কিছু নবী-রাসূলের কাহিনী শোনাতো। রূপকথার গল্প ভেবে আমি সেগুলো শুনতাম। ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য নয়; বরং অবসরের বিরক্তিকর সময়গুলো পার করার জন্য।

[২]

সময়টা ছিল গা ঝিমঝিমে ভরদুপুর। অফিসের জানালার ফাঁক ভেদ করে উত্তরীয় দমকা হাওয়া প্রবেশ করছে। মধ্যাহ্নভোজে মুনীর ভাইয়ের সাথে একই টেবিলে বসেছি। নাঈম, রাফি ওরাও আমাদের সাথে যোগ দিল। নাঈম গরুর গোশত এনেছে। সেদিকে তাকাতেই আমার গা রি রি করে উঠল । খানিক পরে রাফি, মুনীর ভাই দু'জনে গোশতে ভাগ বসালো। বাদ পড়লাম আমি। নাঈম আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অজয় দাদা! আপনাকেও দু'পিস গোশত দেই?

নাঈমের কথাটা বজ্রাঘাতের মতো আমায় আঘাত করল। চড়াৎ করে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠল। রক্তবর্ণ চোখে ধমকিয়ে উঠলাম। অকস্মাৎ আমার রূঢ় আচরণে উপস্থিত সকলে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। নাঈম মাথা নিচু করে অপরাধী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। আমার এই আচরণে মুনীর ভাই খুব ব্যথিত হ'ল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনার ধর্মগ্রন্থে কোথায় আছে, গরুর গোশত খাওয়া যাবে না? দেখাতে পারবেন? এই যে আপনারা মূর্তিপূজা করেন এটাও কী কোথাও লেখা আছে'?

আমার মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবটা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাঁই করে মুনীর ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। আমার মনের রঙিন আকাশে মুহূর্তেই কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। অদ্ভুত তো! কোন দিন নিজের ধর্মগ্রন্থটাই পড়ে দেখিনি! এই প্রথম নিজেকে জ্ঞানশূন্য মনে হ'তে লাগল। ডাইনিং রুমে অফিসের সকল স্টাফ হা করে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। জুনিয়র একজন কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় লজ্জায়, অপমানে হনহন করে বেরিয়ে এলাম।

শেষ বিকেলে সূর্যের স্বর্ণাভা যখন মেঘের ফাঁক গলে পৃথিবীর বুকে উঁকি দিল, তখন অফিস শেষে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য আমাদের এলাকার মন্দির। সেখানে পুরোহিত কাকা আছেন। তার কাছে সব উত্তর জানতে হবে। তারপর সকলের সামনে মুনীর ভাইকে উচিত জবাব দিয়ে অপমানের বদলা নেব।

মন্দিরে ঢুকে পুরোহিত কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার উত্তরের সপক্ষে কিছু যুক্তি দাঁড় করালেন। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ থেকে কোন রেফারেন্স দিতে পারলেন না। এছাড়াও তিনি আমাকে সবসময় 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপতে বললেন। তার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। আমার মনটা আগের চেয়ে বেশী চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে কোন উপায়েই হোক আমাকে জানতে হবে। মুনীর ভাইকে উচিত জবাব দিতে হবে। তবেই এই চঞ্চল মন শান্ত হবে।

[৩]

ইদানীং কোন কিছুতেই মন বসছে না। পুরোহিত কাকার কথামতো সকাল-সন্ধ্যা জপ করেও মনে শান্তি মিলছে না। বুকের কোথাও একটা চাপা অস্থিরতা ভর করে আছে। হয়তো মুনীর ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার অস্থিরতা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পাখিরা ফিরছে আপন নীড়ে। গোধূলির রক্তিম আভাও ফিকে হ'তে শুরু করেছে। ইউটিউবে চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি ভিডিওতে চোখ দু'টো স্থির হ'ল। একটি ডিবেট। হিন্দু স্কলারের বিপরীতে মুসলিম স্কলার। অনেক লম্বা সময় হলেও দেখার জন্য মন স্থির করলাম। লম্বা মতো লোকটি কোর্ট, টাই, প্যান্ট পরা। উনি মুসলিম স্কলার। সব ধর্মগ্রন্থ তার মুখস্থ। শত শত মানুষের সামনে পটাপট রেফারেন্স দিচ্ছেন। অপরদিকে ভারতবর্ষের আরেক বিখ্যাত হিন্দু স্কলার। উনি সেই লোকটির সাথে পারছেন না। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

সেই ডিবেট থেকে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। আমার ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু তথ্য, যা আমার ভিতকে নাড়িয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। সেদিনের পর

থেকে আমার জ্ঞানের স্পৃহা আরও বেড়ে গেল। ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম।

[৪]

কিছুদিন হ'ল আমি মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি। মূর্তিকে নমস্কার করছি না। বিষয়গুলো বাবা-মায়ের নযর এড়িয়ে যাচ্ছে না। তারা সন্দেহের চোখে তাকায়। ছেলে তাদের পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি জেনে গেছি, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মূর্তিপূজার কথা বলা হয়নি। তবে কেন হিন্দুরা মাটির প্রতিমাকে পূজা করে? তাদেরকে ঈশ্বর মনে করে? একজন মানুষের কি অনেক ঈশ্বর থাকতে পারে?

সেই দিক থেকে মুসলিমরা সম্পূর্ণ আলাদা। তারা এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী। অন্যকে স্রষ্টার সমকক্ষ মনে করাকে জঘন্য পাপ মনে করে। বিষয়গুলো গভীরভাবে নাড়িয়ে দিল আমায়। সত্য-মিথ্যা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ভেতর থেকে কী এল স্রষ্টাকে খুঁজে নেয়ার। ধামাচাপা দেয়া বোধগুলো জ্বালাতন করে উঠল।

কৃষ্ণ কি আমার ঈশ্বর? আমার সৃষ্টিকর্তা? কিন্তু কৃষ্ণ যে রাঁধার সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়েছিল! ঈশ্বর কি তার সৃষ্টির সাথে সম্পর্কে জড়াতে পারে? প্রশ্নগুলো কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল বারবার। আমি ভুলে যাই মুনীর ভাইকে উচিত জবাব দিয়ে অপমানের বদলা নেয়ার কথা। হঠাৎ চোখ দু'টো জ্বালা করে এল। এই জ্বালা করাকে আমি চিনিনা। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ আকস্মিক।

ছুটলাম নাঈম এবং রাফির কাছে। জানতে চাইলাম ঈশ্বর সম্পর্কে। নাঈম আমতা আমতা করছিল। আমার সেদিনের রাগের কথাটা হয়তো মনে পড়েছে। তবে রাফি খানিক ভেবে বলল, 'দাদা! আপনি বরং একটা কাজ করুন! আপনার ঈশ্বরকে ডাকুন। তিনি যদি সত্যি আপনার ডাক শুনে থাকে, তাহ'লে অবশ্যই সাড়া দেবে'। রাফির কথাটা আমার মনের ছিন্ন ভিন্ন ক্ষতে সুখের প্রলেপ লাগিয়ে দিল। এরকমটা তো ভেবে দেখিনি! মুহূর্তেই আমার কম্পিত হৃদয়ে আশার ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল।

[৫]

কেটে গেছে কয়েক পক্ষকাল। আমি আজও সত্যের দিশা পায়নি। ছুটছি পথহারা পথিকের মতো। মনের গহীন থেকে কেউ একজন বলে, সৃষ্টিকর্তা আছে। সেই ভাবনা থেকে আজও শয়নে, জাগরণে, চলাফেরায় তাঁকে স্মরণ করি। যদি সত্যিই তুমি থেকে থাকো, তবে নিদর্শন দেখাও! কথা দিচ্ছি, তোমার জন্য আমি সবকিছুই বিসর্জন দিতে রাযী। এভাবেই স্রষ্টাকে রোজ বলতাম।

মুনীর ভাই বলেছিল, তাদের নবী-রাসূলদের সাথে অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটত। তাই আমিও ভাবি, আমাকেও ঈশ্বর নিদর্শন দেখাবে। তাই তো কত বিনিদ্র রাত কেটেছে আকাশ পানে তাকিয়ে। এই বুঝি ঈশ্বর বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার অস্তিত্বের জানান দেবে! কিন্তু না, সেরকম কিছুই ঘটেনি!

এখন আমার কল্পনা জুড়ে শুধুই স্রষ্টার বাস। কে আমার স্রষ্টা? কৃষ্ণ নাকি অন্য কেউ? এখন নাঈম, রাফির সাথে যদি কখনও আলোচনা হয় তবে স্রষ্টা ও জীবনই থাকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। স্রষ্টাকে ভাবতে গিয়ে কখন যে আমি নিজেই মিডিয়া থেকে বেরিয়ে গেছি, তা ছিল কল্পনাতীত। কয়েক মাস থেকে বন্ধু মহলেও আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পার্থিব জগতের অনেক কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি নিজের অজান্তেই। যেন অদৃশ্য কিছু আমায় নেশার মতো টানছে। আমি ছুটছি টালমাটাল। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আজও আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। খানিক পরে চোখ দু'টো লেগে এল। ক্লান্ত আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

রাতের শেষাংশ। অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। একেবারে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। মাথার কাছে রাখা মুঠোফোনটি বেজে উঠল। ঘুম ঘুম চোখে ফোন তুললাম। অপর পাশ থেকে অচেনা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো। বলল, 'তুমি যেটা মনে মনে ভাবছো সেটাই করো'। চমকে উঠলাম আমি। মুহূর্তেই ঘুম উবে গেল। চোখ খুলে মুঠোফোনটিকে হাতের মধ্যখানে আবিষ্কার করলাম। কল লিস্ট চেক করে কোন নম্বর পেলাম না। এটা কিভাবে সম্ভব? কিছুক্ষণ আগেই তো আমাকে কেউ ফোন করেছিল! তাহলে নম্বরটা কোথায়? অজানা এক আতংকে আমার সমস্ত লোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল। সহসা বুকের ভেতরটা হিম হয়ে উঠল। হাত-পা বার কতক কেঁপে কেঁপে উঠল। বুঝি কাঁপাবার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে অবশ হয়ে গেছে। তখনই সুমধুর কণ্ঠে ভেসে আসলো মুসলিমদের চিরন্তন বাণী 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'! অদ্ভুত এক শক্তি তাড়িত করল আমায়। বুকের ভেতর জমে থাকা ভয়টা ক্রমশঃ কমতে লাগল। হ্যাঙ্গার থেকে শার্টটি লুফে নিয়ে ছুটলাম।

রাফি আমাকে মসজিদের ইমাম ছাহেবের নিকট নিয়ে গেল। তার কাছে সবটুকু বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'হয়তো আপনি সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চেয়েছিলেন। তাই তার পক্ষ থেকে আপনার নিকট ইলহাম এসেছে। এ ঘটনা সেদিকেই ইঙ্গিত করে'। তখন ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম আমার মনের ভিতরে কী চলছিল! আমার মুসলিম বিদ্বেষী মনটা অবচেতন মনেই ঘোষণা দিচ্ছিল কালিমায়ে তাইয়িবার মর্মকথার। স্রষ্টার সমস্ত নকল রূপকে বাদ দিয়ে এক ইলাহের।

তখন মনে হচ্ছিল আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছি! সত্য-মিথ্যা যা কিছু মিলেমিশে ছিল, তার সবটা আমার মস্তিষ্কে স্বচ্ছ পানির মতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একদিকে আমার ক্যারিয়ার, মিডিয়া, পরিবার; অন্যদিকে আমার স্রষ্টা। তিনি সবটা আমার সামনে স্পষ্ট করা সত্ত্বেও কী করে তাকে ধোঁকা দেই?

মসজিদ থেকে বাড়ির পথ ধরেছি। বাবা-মাকে সবার প্রথমে জানাব, স্রষ্টার কাছে আমার আত্মসমর্পণের কথা। জানি না তারা কিভাবে নেবে! হয়তো প্রলয়ঙ্কারী কোন ঝড় উঠবে!

তবে স্রষ্টাকে পাওয়ার তুলনায় সেই ঝড় নিতান্তই তুচ্ছ। মা আমার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দৌড়ে এসে আমার পা দু'টা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। বাবাকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। আজ তিনিও দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। শত চেষ্টা করেও বাবা-মা পারেনি আমাকে ফেরাতে। শেষে বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে জুতা দিয়ে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় আমার গালে।

আজ পৃথিবীর কেউই আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আমি ছুটলাম স্রষ্টার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। সর্বপ্রথম আমার যোহরের ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য হয়। যখন প্রথম সিজদায় যাই, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! নিজেকে এই গ্রহের সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হচ্ছিল। অদ্ভুত এক প্রশান্তি! যা মুহূর্তে আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করে দেয়। আমি ভুলে যাই এইমাত্র ফেলে আসা আমার ক্যারিয়ার, মিডিয়া, পরিবারের কষ্টকে। ওয়াল্লাহি, আমি সারাটি জীবন মনে রাখব জীবনের প্রথম সিজদার অনুভূতি।

[৬]

আমার ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। এর মাঝে ঘটেছে কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা। একদিন ইশরাকের ছালাত শেষে আমি বেরিয়ে পড়ি। আকস্মিক একটি প্রাইভেট কার আমার সামনে চলে আসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার ডান পায়ের উপর দিয়ে গাড়ির সামনের চাকাটা চলে যায়। গাড়ি যখন ব্রেক কষলো তখন পিছনের চাকাটা পায়ের উপর উঠে গেছে। আমার হাতের ইশারায় ড্রাইভার চাকা নামালো। ভেবেছিলাম পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ছুটতে হবে হাসপাতালে। কিন্তু এর কিছুই হয়নি। ওয়াল্লাহি, আমার পায়ে সামান্য চাকার দাগ ছাড়া আর কিছুই হয়নি!

অপর একদিন। মাগরিবের ছালাত আদায় করতে মসজিদে গিয়েছি। হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় উঠল। আমার মনে পড়ল, বাড়িতে বেলকনির দরজা, জানালা সবকিছুই খোলা। বৃষ্টি হ'লে ঘরে পানি আসে। সব কিছুই ভিজে যায়। আমি সিজদায় রবকে বললাম। যখন বাড়ি ফিরলাম তখন হৃদয়টা শীতল হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এতো ঝড় হওয়ার পরও ঘরে পানি ঢুকেনি। দরজার পর্দাটাও ভিজেনি। আল্লাহুছ ছামাদ। এ আমার রব ছাড়া আর কার ক্ষমতা হ'তে পারে?

আজ আমি বাড়িতে যাচ্ছি। বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে। আমি হাঁটছি আর ভাবছি, জীবন কত অদ্ভুত তাইনা! গত মাসেও আমি ছিলাম পথহারা। কিছু সময়ের ব্যবধানেই সব কেমন পাল্টে গেছে। এখন আমার কোন কিছু হারিয়ে ফেলার ভয় নেই।

দূর থেকে আব্বার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তিনি পাড়ার মুসলিম ছেলেদের বলছেন, 'এই ছেলে তোমরা ছালাত পড় না? জানো, আমার ছেলে মুসলিম হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ে'।

আমি হাসছিলাম আব্বার কথা শুনে। একসময় যিনি আমার ইসলাম গ্রহণের চরম বিরোধী ছিলেন, আজ তার মুখ থেকে এই কথা শুনে হৃদয়টা আবারও রবের দরবারে কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়ল। আশা রাখি, আব্বাও একদিন ইসলামে প্রবেশ করবে। আজ আবারও আব্বাকে বলব, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল' *(বণী ইসরাইল-১৭/৮)*।

[গল্পটি বাংলাদেশী নওমুসলিম মুহাম্মাদ আল-আমীনের ইসলাম গ্রহণের সত্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত]

ভয়ংকর নাছীহাহ

একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। যার অনেক ছাত্র ছিল। যখনই তার কাছে নতুন কোন শিষ্য আসতো, তিনি তার পরীক্ষা নিতেন।

তিনি কিছু তোতা পাখি পালতেন। আর পাখিগুলোকে তিনি একটি কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন, কথাটি হল; 'শিকারী আয়েগা, দানা ডালেগা, জাল বিছায়েগা, ফাসনা নেহি'। অর্থাৎ 'শিকারী আসবে, খাবার দিবে, জাল পাতবে, ফেঁসে যেও না'।

যখনই নতুন কোন ছাত্র আসতো তখনই তিনি তাকে কিছু দানা আর একটি জাল দিয়ে বলতেন, 'যাও ঐ গাছের নিচ থেকে কিছু তোতা পাখি ধরে নিয়ে আসো'।

পাখিগুলো মানুষ দেখামাত্রই এই বলে গান গাইতে শুরু করতো যে, 'শিকারী আয়েগা, দানা ডালেগা, জাল বিছায়েগা, ফাসনা নেহি'। তখন বেশিরভাগ ছাত্রই ফিরে আসতো এই ভেবে যে, এত চালাক পাখি ধরা যাবে না!

কিন্তু যদি কোন ছাত্র জাল পাততো আর দানা দিতো তবে দেখতো যে, পাখিগুলো মুখে ঐ কথা বলছে ঠিকই কিন্তু দানা খেতে আসছে আর জালে ফেঁসে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের মুখের কথা তাদের কোন কাজেই আসছে না।

এই পাখিগুলো আসলে কি বলছে তারা সেটা নিজেরাই জানে না। পাখিগুলো জানে না- 'শিকারী' কি জিনিস! 'জাল' কি জিনিস! 'ফাসনা' কি জিনিস! তাই তারা মুখে যতই গান গাক না কেন, তাও জালে ফেঁসে মৃত্যু ডেকে আনছে।

★ আজকের যামানায় আমাদের অবস্থাও ঠিক যেন তোতা পাখিদের মতই হয়ে গেছে। আমরা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিন্তু আমরা এর মর্ম জানি না। প্রত্যেক ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ি। কিন্তু আমরা বুঝি না এর ভিতর আল্লাহ কি বলতে চেয়েছেন।

একই সাথে আমরা সুদ-ঘুষ, পরনিন্দা, অহংকার, যিনা, গীবত, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা সহ অসংখ্য হারাম কাজ করছি আর তোতা পাখির মতই আবার কালেমা বলছি আর নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবীও করছি! কাজেই আমাদের এই সাক্ষ্যদান তোতা পাখির মত। আমরা মুখে কালেমা জপার পরেও শিকারীর জালে ফেঁসে যাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক দ্বীন শিখে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন।

সংগঠন সংবাদ

কর্মী প্রশিক্ষণ (অনলাইন)

১৯ ও ২০শে আগস্ট ২০২১ ইং বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক দেশব্যাপী এক অনলাইন কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালামের স্বাগত বক্তব্য এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ১ম দিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়ে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত কর্মশালা অব্যাহত থাকে। এতে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (প্রশিক্ষণ কি ও কেন?), কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন (কর্মীর পরিচয় ও গুরুত্ব এবং যোগ্য কর্মী তৈরীর উপায়), কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী (ছহীহ আক্বীদা ও মানহাজ কী ও কেন?), কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর (দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে আধুনিক মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার : গুরুত্ব ও পদ্ধতি), কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (সফল ক্যারিয়ার গঠনে করণীয়), কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (সুশৃংখল জীবন গঠনে ইহতিসাব সংরক্ষণ : গুরুত্ব ও পদ্ধতি), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম (কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলী), কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রুহানী তারবিয়াত), সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নুরুল ইসলাম (ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন : গতি ও প্রকৃতি); আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন (জিহাদের পরিচয় ও প্রকৃতি : বর্তমান যুগে এর পদ্ধতি ও ক্ষেত্রসমূহ), কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম (সংগঠন কী, কেন এবং কিভাবে করব?), সঊদী আরব শাখা সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী (দাওয়াতী ময়দানে আধুনিক যুবসমাজের ভূমিকা : করণীয় ও বর্জনীয়); কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম (আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিলগ্নে প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রায় দেড় শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা** : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট **মসজিদ** কমপ্লেক্স **নির্মাণের** প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : মানব জাতির দ্বিতীয় পিতার নাম কী?
উত্তর : হযরত নূহ (আঃ)।

২. প্রশ্ন : কোন নবীর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল'?
উত্তর : ইয়াকুব (আঃ)-এর।

৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর মাতা আমেনা কোন গোত্রের ছিলেন?
উত্তর : বনু যোহরা।

৪. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কোন উর্ধ্বতন পুরুষ আরবের কুরায়েশ বলে খ্যাতিমান ছিলেন?
উত্তর : ফিহর।

৫. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ কোন নবী দিয়েছিলেন?
উত্তর : হযরত ঈসা (আঃ)।

৬. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কত বয়সে 'হিলফুল ফুযূল' প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : ২০ বছর বয়সে।

৭. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর কত জন চাচা ছিল?
উত্তর : ৯ জন।

৮. প্রশ্ন : 'যমযম' কূপ খনন করেন কে?
উত্তর : আব্দুল মুত্তালিব।

৯. প্রশ্ন : হাশেমের কতটি পুত্র সন্তান ছিল?
উত্তর : ৪টি।

১০. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ মাতা হালিমা কোন গোত্রের ছিলেন?
উত্তর : বনু সা'দ।

১১. প্রশ্ন : ফিজার যুদ্ধে কারা জয়লাভ করে?
উত্তর : কুরায়েশরা।

১২. প্রশ্ন : আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া।

১৩. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে আবু লাহাবের কোন মহামারীর ফোঁড়া দেখা দেয়?
উত্তর : গলায় প্লেগ বা আজকের ভাষায় যাকে 'গুটি বসন্ত' (Small Pox) বলা যায়।

১৪. প্রশ্ন : আবু লাহাবের দু'জন পুত্র ও তিন কন্যা কখন মুসলমান হন?
উত্তর : মক্কা বিজয়ের পর।

১৫. প্রশ্ন : মক্কায় বিদ্রূপকারীদের ৫ নেতা নাম কী?
উত্তর : বনু সাহম গোত্রের 'আছ বিন ওয়ায়েল, বনু আসাদ গোত্রের আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব, বনু যোহরা গোত্রের আসওয়াদ বিন 'আব্দে ইয়াগূছ, বনু মাখযূম গোত্রের অলীদ বিন মুগীরাহ এবং বনু খুযা'আহ গোত্রের হারিছ বিন তুলাত্বিলা।

১৬. প্রশ্ন : মাক্কী জীবনে কয়টি সূরা নাযিল হয়েছে?
উত্তর : ৮৬টি।

১৭. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় কত বছর কাটান?
উত্তর : জীবনের বাকী ১০ বছর।

১৮. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয়ের নাম কী?
উত্তর : হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক্ব (আঃ)।

১৯. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার নাম কী?
উত্তর : পিতা আব্দুল্লাহ ও মাতা আমেনা।

২০. প্রশ্ন : কুছাই-পুত্র আব্দুল মানাফের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর : মুগীরাহ।

২১. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর বড় চাচার নাম কী?
উত্তর : যুবায়ের।

২২. প্রশ্ন : পিতা আব্দুল্লাহ্র রেখে যাওয়া একমাত্র মুক্ত দাসীর নাম কি?
উত্তর : উম্মে আয়মান।

২৩. প্রশ্ন : খাদীজা (রাঃ)-এর মুক্ত দাসের নাম কি?
উত্তর : যায়েদ বিন হারেছাহ।

২৪. প্রশ্ন : চাচা আবু ত্বালিবের অপর নাম কি?
উত্তর : আব্দু মানাফ।

২৫. প্রশ্ন : মক্কা থেকে 'আবওয়া'-এর দূরত্ব কত?
উত্তর : ২৫০ কি. মি.।

২৬. প্রশ্ন : ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ার গমনকালে কোন পাদ্রীর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়?
উত্তর : পাদ্রী বাহীরা।

২৭. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কত বছর বয়সে বিবাহ করেন?
উত্তর : ২৫ বছর।

২৮. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তান-সন্ততি কতটি?
উত্তর : ৩টি পুত্র ও ৪ কন্যা।

২৯. প্রশ্ন : খাদীজার গর্ভজাত সন্তান কতটি?
উত্তর : ইবরাহীম ব্যতীত বাকী ৬টি।

৩০. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের মোহরানা কি ছিল?
উত্তর : ২০টি উট।

৩১. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও খাদীজা উভয়ের দাম্পত্য জীবন কত দিনের?
উত্তর : ২৫ বছর।

৩২. প্রশ্ন : মৃত্যুকালে খাদীজার বয়স কত ছিল?
উত্তর : ৬৫ বছর।

৩৩. প্রশ্ন : ইবরাহীমী যুগ থেকে কা'বাগৃহের উচ্চতা কত ছিল?
উত্তর : ৯ হাত উঁচু।

৩৪. প্রশ্ন : প্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয় কত খৃষ্টাব্দে?
উত্তর : ৬১০ খৃষ্টাব্দে।

৩৫. প্রশ্ন : কত বছর বয়সে রাসূলের উপর প্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : সৌরবর্ষ হিসাবে ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিনে।

৩৬. প্রশ্ন : খাদীজার চাচাতো ভাইয়ের নাম কী?
উত্তর : ওয়ারাক্বা বিন নওফাল।

৩৭. প্রশ্ন : আলী (রাঃ)-এর সাথে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ হয় কোন সময়?
উত্তর : ২য় হিজরীর ছফর মাসে।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মোট উপযেলা কতটি?
উত্তর : ৪৯৫টি।

২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জকিগঞ্জ, সিলেট।

৩. প্রশ্ন : দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কারক কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (BAPEX)।

৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশের শীর্ষ আমদানী পণ্য কোনটি (টাকার অংকে)?
উত্তর : তুলা।

৫. প্রশ্ন : বর্তমানে মাথাপিছু জিডিপি কত?
উত্তর : ২,০৯৭ মার্কিন ডলার।

৬. প্রশ্ন : বর্তমানে মন্ত্রীসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ৪৯ জন।

৭. প্রশ্ন : মন্ত্রীসভায় প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা কত?
উত্তর : ২০ জন।

৮. প্রশ্ন : মন্ত্রীসভায় উপমন্ত্রীর সংখ্যা কত?
উত্তর : ৩ জন।

৯. প্রশ্ন : একক দেশ হিসাবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানীতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ষষ্ঠ।

১০. বিশ্বে রফতানীতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ষষ্ঠ।

১১. প্রশ্ন : সুনামগঞ্জ যেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপযেলার বর্তমান নাম কী?
উত্তর : শান্তিগঞ্জ।

১২. প্রশ্ন : বর্তমান পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : ড. শামসুল আমল।

১৩. প্রশ্ন : 'ভাসানচর' কোন যেলায় অবস্থিত কোথায়?
উত্তর : নোয়াখালীতে।

১৪. প্রশ্ন : দেশের তৃতীয় সাফারী পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয় কোথায়?
উত্তর : মৌলভীবাজারের জুড়ী উপযেলার লাঠিটিলায়।

১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ কততম দেশ হিসাবে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LVH) ক্লাবে প্রবেশ করে?
উত্তর : ৪২তম।

১৬. আবহাওয়া সূচকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ১৫তম।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (ICAO) বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তর : হুয়ান কার্লোস সালাজার।

২. প্রশ্ন: ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির (CARICOM) বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তর : কারলা নাটলি বার্নেট।

৩. প্রশ্ন : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বাদশ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : ৩০শে নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর ২০২১।

৪. প্রশ্ন : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

৫. প্রশ্ন : বিশ্বে রফতানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

৬. প্রশ্ন : বিশ্বের আমদানী শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৭. প্রশ্ন : পোশাক রফতানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

৮. প্রশ্ন : ২৯শে জুলাই ২০২১ মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধন করে কোন দেশ?
উত্তর : ইরান।

৯. প্রশ্ন : মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : ইসমাইল সাবরী ইয়াকুব।

১০. প্রশ্ন : জাম্বিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কী?
উত্তর : হাকাইন্ডে হিচিলিমা।

১১. প্রশ্ন : সম্প্রতি তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা কবে দখল করে ?
উত্তর : ১৫ই আগষ্ট ২০২১।

১২. প্রশ্ন : বর্তমানে আফ্রিকার কোন দেশ মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে?
উত্তর : সিয়েরালিওন।

১৩. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন দেশ সবচেয়ে উঁচুতে সড়ক নির্মাণের রেকর্ড গড়ে।

১৪. উত্তর: ভারত। লাদাখের দুর্গম পার্বত্যা ঞ্চলের এ সড়ক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৯,৩০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

১৫. প্রশ্ন : আরব আমিরাতে ইসরায়েলের প্রথম রাষ্ট্রদূত কে?
উত্তর : আমির হাইক।

১৬. প্রশ্ন : মিয়ানমারে আসিয়ানের বিশেষ দূত কে?
উত্তর : আরিয়ান ইউসুফ (ব্রুনাই)।

১৭. প্রশ্ন : আবহাওয়া সূচকে ঝুঁকিপূর্ণ সবচেয়ে দেশ কোনটি?
উত্তর : মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

মীলাদ প্রসঙ্গ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

এ বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- বিদ'আতের সংজ্ঞা ও পরিণাম
- ঈদে মীলাদুন্নবী
- মীলাদের আবিষ্কর্তা
- মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী
- ক্বিয়ামপ্রথা
- মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্প সমূহ
- আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী ইসলাম
- প্রেমের প্রদর্শনী

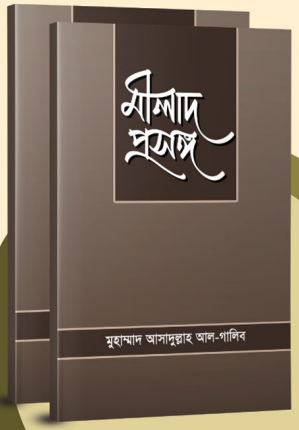

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে বই, পত্রিকা, ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালপত্র, পোস্টার, লিফলেট, কার্ড, ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে ও নিখুঁতভাবে ছাপানো এবং নিজস্ব বাইণ্ডিং কারখানায় অটো মেশিনে ভাঁজ ও মানসম্পন্ন বাঁধাই করা হয়।

বিঃদ্রঃ : প্রাণীর ছবি সংবলিত এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বিরোধী কোন কিছু ছাপানো হয় না।

যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭৫৮-৫৩৫৫৪৯

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ মূল্য : ২৫ টাকা

সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

কর্মী সম্মেলন ২০২১

৯ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সকাল ৮টা

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

সভাপতি

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রধান অতিথি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখবেন :

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২